একক ৪১ ❐ চর্যাগীতি—নির্দিষ্ট পাঁচটি গীতি

গঠন

৪১.১ উদ্দেশ্য
৪১.২ প্রস্তাবনা
৪১.৩ মূলপাঠ
৪১.৩.১ পদ পরিচিতি (পাঠ্যান্তর প্রসঙ্গ)
৪১.৩.২ পদকর্তা পরিচিতি
৪১.৪ বাচ্যার্থ
৪১.৫ গূঢ়ার্থ
৪১.৬ সমাজচিত্র
৪১.৭ আধ্যাত্মভাবনা
৪১.৮ কাব্যমূল্য
৪১.৯ শব্দার্থ, টীকা, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য
৪১.১০ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর দাবি
৪১.১১ বিশিষ্টতা, উপসংহার
৪১.১২ অনুশীলনী
৪১.১৩ উত্তরমালা
৪১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৪১.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের ফলে শুধু বাংলা ভাষা নয়—সমগ্র পূর্বাঞ্চলের নব্য ভারতীয় ভাষার প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে'র ৫ জন পদকর্তার পদ আলোচনাসূত্রে আদিযুগের ধর্মপ্রধান এই পদগুলিতে প্রকাশিত বৌদ্ধ সহজিয়া তত্ত্বকথা, তৎকালীন সমাজ জীবন, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদির পরিচয় জানা যাবে।

- রূপকের মোড়কে বৌদ্ধ-সাধনতত্ত্বের জটিলতার মধ্যেও সিদ্ধাচার্যগণ কাব্য সৌন্দর্যের যে দ্যুতি ছড়িয়েছেন—সে সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে দশম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছনো যাবে।
- বিভিন্ন চর্যাপদ পাঠে বৌদ্ধ সাধনতত্ত্বের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে।
- লোকজীবনের নানা ক্রিয়াকর্ম, আচার-আচরণ, আমোদ-প্রমোদ, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ-অলঙ্কার ইত্যাদির স্পষ্ট চিত্রও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে।
- চর্যাপদ মূলত ধর্মতত্ত্ব ও সাধনা-বিষয়ক রচনা হলেও এর সাহিত্যমূল্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে।

- ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে "হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা" নামে যে গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন—তা থেকেই এই এককে বিশিষ্ট কবিদের পদগুলি তুলে ধরে আলোচনা করা হলো যাতে পৃথক পৃথক পদকর্তার চিন্তা-চেতনার নানা দিক এবং এঁদের কবি-কৃতি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা সহজ হয়।

- নেপাল রাজদরবার থেকে আবিষ্কৃত মুনি দত্তের টীকা সহ ৫০টি পদ পাওয়া গেলেও চর্যাপদের মূল পুঁথিতে ২৪টি বিভিন্ন ভণিতায় লিখিত ৪৬১/২টি পদ পাওয়া যায়। ৫০টি চর্যায় ২৪জন সিদ্ধাচার্য কবির নাম আমরা পাই। তাঁরা হলেন—(১) লুই, (২) কুক্কুরী পা, (৩) বিরুআ, (৪) গুণ্ডুরী, (৫) চাটিল, (৬) ভুসুকু, (৭) কাহ্ন, (৮) কামলি, (৯) ডোম্বী, (১০) শান্তি, (১১) মহিন্তা, (১২) বীণা, (১৩) সরহ, (১৪) শবর, (১৫) আজদেব, (১৬) ঢেন্ডনপা, (১৭) দারিক, (১৮) ভাদে, (১৯) তাড়ক, (২০) কঙ্কন, (২১) জঅনন্দি ; (২২) ধাম, (২৩) তন্ত্রীপাদ এবং (২৪) লাড়ী ডোম্বী। তবে ড. সুকুমার সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে পদগুলির ভণিতা অনুসারে পদকর্তাকে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। তাঁদের মতে কেউ কেউ গুরুর ভণিতা দিয়েছেন। এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নামের সঙ্গে গৌরবসূচক 'পা' শব্দটি যোগের মধ্যে। আবার কিছু কিছু পদ ছদ্মনামে লিখিত বলে ড. সুকুমার সেন মনে করেন।

  এই এককে লুই পাদ, শবর পাদ, টেণ্টন পাদ, ভুসুকু পাদ ও চাটিল পাদের একটি করে পদ আছে। প্রতিটি পদের পাঠান্তর ও ভাবানুবাদের সঙ্গে টীকাসহ নানাদিক থেকে তাদের আলোচনা করা হয়েছে। পদগুলি এবং তাদের সম্পর্কে আলোচনা পাঠ করলে চর্যাপদ সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা গড়ে তোলা যাবে।

- 'সন্ধ্যাভাষা' অর্থাৎ আলো-আঁধারি ভাষায় রচিত এই পদগুলি প্রথম পাঠকালে খটমট লাগলেও দু'তিনবার পাঠ করে টীকা অংশের সহজ অর্থ জানার পর পদগুলি আর কঠিন বলে মনে হবে না। 'বাঙলা সাহিত্যে'র প্রথম পর্যায়ের চর্যাপদ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান এই এককের পদগুলি পাঠ করার পর আরো সমৃদ্ধ হবে।

৪১.২ প্রস্তাবনা

পাঁচটি চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গুহ্য সাধন-সংকেত রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। মহাযান ধর্মমত বিবর্তিত হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজ যান ইত্যাদি নানা ভাগের সৃষ্টি হয়। বজ্রযানের পরের স্তরই হলো সহজযান। মন্ত্র-তন্ত্র, দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পনা, পূজা-আচার-অনুষ্ঠানে সহজযানীদের বিশ্বাস ছিল না। গুরু নির্দেশিত গুহ্য পথ ধরে কায়া-সাধনার ব্যক্তিগত মুক্তি ও সিদ্ধির প্রতিই এঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে, আনন্দ-বেদনার তালে তালে বহমান বাস্তব জীবনের জরা-মরণ ও পুনর্জন্মের বিষচক্র পেরিয়ে নির্বাণ লাভই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ এই পথেরই পথিক। তবে মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে তাঁরা নির্বাণ লাভের গূঢ় তান্ত্রিক আচার-আচরণের কথাই বলেছেন। বিভিন্ন পদে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তবে কোনো কোনো চর্যা গীতিতে তত্ত্ব উপদেশ ও সাধনার ইঙ্গিত সম্পূর্ণভাবে গোপনীয় আছে বাহ্য অর্থের আবরণে। এই এককের চারটি চর্যাপদ তুলে ধরে প্রতিটি পদের সার্বিক আলোচনা করা হ'ল।

৪১.৩ মূল পাঠ

১

[পুথিপৃষ্ঠা ৩। খ]

।। **রাগ পটমঞ্জরী—লুইপাদানাম্।।**

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো[১] কাল।। ধু।।
দিঢ়[২] করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।।
ঁলুই ভণইঁ গুরু পুচ্ছিঅ জাণ। ধু।।
সঅল [৪] স [মা] হিঅ[৪] কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই[৫] ।। ধু।।
এড়িএউ[৬] ছান্দক বান্ধ[৭] করণক পাটের[৭] আস।
সুন্ন[৮] পাখ[৯] ভিড়ি[৯] লাহু রে পাস।। ধু।।
ভণই লুই আম্হে ঝাণে[১০] দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি[১১] পিণ্ডি[১১] [১২]বইটা[১২]।। ধু।।

পাঠান্তর।।

১. পইঠা (বাগচী, শহী)
২. দিট (শাস্ত্রী, সেন)
৩-৩. ভণই লুই (টী)
৪-৪. সমাহি (টী)
৫. মরিঅই (বাগচী)
৬. এড়িঅউ (বাগচী)
৭-৭. করণ কপটের (বাগচী)
৮. সুনু (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)
৯-৯. ভিতি (শাস্ত্রী, সেন)
১০. সাণে (পুথি, সেন)
১০-১১. পাণ্ডি (পুথি)
১২-১২. বইণ (পুথি)

৫

[পুথিপৃষ্ঠা ৯। ক-খ]

।। **রাগ গুর্জরী-চাটিল্লপাদানাম্।।**

ভবণই গহণ[১] গম্ভীর[১] বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাই।। ধু।।
ধামার্থে[২] চাটিল[২] সাঙ্কম [৩]গঢ়ই[৩]।
পারগামিলোঅ নিভর তরই।। ধু।।
[৪]ফাড্ডিঅ[৪] মোহতরু[৫] পাটি[৫] জোড়িঅ।
আদহ[৬] দিঢ়[৬] টাঙ্গী নিবাণে[৭] কোহিঅ[৭]।। ধু।।
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
ণিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী।। ধু।।
জই তুম্হেলোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী।। ধু।।

পাঠান্তর।।

১-১. পুথিতে গম্ভীর—এরপর একটি কাটা আ-কার চিহ্ন আছে। তদনুসারে 'গম্ভীরা' (সেন)।

২-২. পুথিতে চাটিব লিখে তার 'ব' কেটে মাথায় 'ল' লেখা আছে।

৩-৩. গটই (শাস্ত্রী)। ৪-৪. ফাড়িঅ (টীকা) ৫-৫. পাটি (পুথি, শাস্ত্রী, সেন)

৬-৬. দিটি (শাস্ত্রী), দিঢ়ি সেন, শহী)

৭-৭. কোড়িঅ (সেন, শহী, বাগচী)

৬

[পুথিপৃষ্ঠা ১১। ক]

।। রাগ পটমঞ্জরী—ভুসুকুপাদানাম্।।

[১]কাহেরে[১] ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
[২]বেঢ়িল[২] [৩]হাক[৩] পড়অ চৌদীস।। ধু।।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ [৪]ভুসুকু[৪] অহেরী।। ধু।।
তিণ ন [৫]চ্ছুপই[৫] হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী।। ধু।।
হরিণা [৬]বোলঅ হরিণা সূণ হরিআ[৬] তো।।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।। ধু।।
[৭]তরসঁন্তে[৭] হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুক ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ [৮]পইসঈ[৮]।। ধু।।

পাঠান্তর।।

১-১. কাহৈরি (পুথি, শাস্ত্রী), ২-২. বেটিল (শাস্ত্রী, সেন)

৩-৩. ডাক (সেন), ৪-৪. ভুকু (পুথি), ভুকুঅ (শাস্ত্রী)

৫-৫. ছুবই (শহী), খণ্ডই (টীকা)

৬-৬. বোলঅ সুণ হরিণা (বাগচী), বোলই হরিণা সুণ (শহী)

৭-৭. তরঙ্গান্তে (শাস্ত্রী), তরঙ্গাতে (শহী), তরঙ্গাতে (টীকা)

৮-৮. পুথিতে 'পয়ইসই' লিখে য় বর্ণটি বর্জনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

২৮

[পুথিপৃষ্ঠা ৪১। খ-৪২। ক]

।। রাগ[১] বলাড্ডি[১]—শবরপাদানাম্।।

[২]উঞ্চা উঞ্চা[২] পাবত[৩] তঁহি[৩] বসই সবরী বালী।
[৪]মোরঙ্গি[৪] পীচ্ছ[৫] পরহিণ[৫] সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।। ধু।।
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী [৬]গুহাড়া[৬] [৭]তোহৌরী[৭]।

নিঅ[৮] ঘরিণী[৮] ণামে সহজ সুন্দারী।। ধু।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
এঁকেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।। ধু।।
তিঅধাউ খাট পড়িলা সবরো[৯] মহাসুহে[৯] সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গা[১০] ণইরামণি[১০] দারী পেম্মা রাতি পোহাইলী।। ধু।।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন[১১] নিরামণি[১১] কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি[১২] পোহাই[১২] ।। ধু।।
গুরুবাক[১৩] পুঞ্চআ[১৩] বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ।
একে সরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ।। ধু।।
উমত সবরো গরুআ [১৪]রোষে[১৪]।
গিরিবরসিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।। ধু।।

পাঠান্তর।।

১-১ বরাটি (তিব্বতী)
২-২ উঁচা উঁচা (শাস্ত্রী, বাগচী), উচা (টীকা)
৩-৩ তহি (বাগচী) তহিঁ (শহী)
৪-৪ সোরাঙ্গ (শহী)
৫-৫ পরিহাণ (শহী)
৬-৬ গুহারী (শহী)
৭-৭ তোহোরি (বাগচী), শহী-তে পদটি পরের পঙ্‌ক্তির গোড়ায় আছে। পুথিতে এই পদের পর যতিচিহ্ন নেই।
৮-৮ ঘরণী (সেন)
৯-৯ মহাসুখে (বাগচী)
১০-১০ নৈরামণী (বাগচী)
১১-১১ পুথিতে 'রি'-র উপবে 'নি'-র Over-writing আছে। নৈরামণি (বাগচী, শহী)।
১২-১২ পোহাম (পুথি) ১৩-১৩ পুচ্ছিআ (বাগচী), ধনুআ (শহী)।
১৪-১৪ পুথিতে 'সরোষে' লিখে, 'স' কাটা হয়েছে। গরু আস রোষে (সেন)। রোসেঁ (শহী)।।

৩৩

[পুথিপৃষ্ঠা ৪৮। ক]

।। রাগ পটমঞ্জরী—[১]টেণ্টণ[১] পাদানাম্।।

টালত মোর ঘর নাঁহি [২]পড়বেষী[২]।
[৩]হাড়ীত[৩] ভাত [৪]নাঁহি[৪] নিতি আবেশী।। ধু।।
[৫]বেঙ্গাসঁ সাপ[৫] [৬]বডহিল জাঅ[৬]।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে [৭]যামাঅ[৭]।। ধু।।
[৮]বলদ[৮] বিআএল গবিআ [৯]বাঝেঁ[৯]।
পিটা দুহিএ এ তিনা [১০]সাঁঝে[১০]।। ধু।।
জো সো [১১]বুধী[১১] [১২]সৌ নিবুধী[১২]।
জো যো [১৩]চৌর[১৩] [১৪]সৌ দুষাধী[১৪]।। ধু।।
[১৫]নিতে নিতে[১৫] ষিআলা ষিহে যম জুঝতা।
টেণ্টণ পাএর গীত [১৬]বিরলে[১৬] বুঝঅ।। ধু।।

পাঠান্তর।।

১-১	ঢেন্ঢণ (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)	২-২	পড়বেশী (বাগচী) পড়বেসী (শহী)
৩-৩	হুণ্ডী (টীকা)	৪-৪	নাহি (বাগচী, শহী)
৫-৫	বেঙ্গা সংসার (শাস্ত্রী) বেগ সংসার (সেন) বেঙ্গাস সাপ (বাগচী)		
৬-৬	চঢ়িল জাই (শহী)	৭-৭	সামাই (শহী)
৮-৮	বলদা (টীকা)	৯-৯	বাঁঝে (বাগচী, শহী)
১০-১০	সাঁঝ্যে (পুথি)	১১-১১	বুদ্ধি (টীকা)
১২-১২	সোহি নিবুধী (শহী)	১৩-১৩	চোর (বাগচী, শহী)
১৪-১৪	সোই সাধী (বাগচী) সোহি সাধী (শহী)		
১৫-১৫	নিতি নিতি (টীকা, বাগচী, শহী)	১৬-১৬	বিচিরলেঁ (পুথি)

৪১.৩.১ পদ পরিচিতি (পাঠান্তর প্রসঙ্গ)

(১) লুই পাদের প্রথম সংখ্যক পদ—
লুই পাদের 'কা আ তরুবর পঞ্চ বিডাল' গীতটির রাগ পটমঞ্জরী। ১০টি চরণে বিধৃত পদটিতে রূপকের মোড়কে সহজিয়া সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। এই গানটিকে টীকাকার মুনি দত্ত 'মহারাগনয়চর্চা' অর্থাৎ মহাঅনুরাগের পদ্ধতির রূপ বলে চিহ্নিত করেছেন।

(২) চাটিল বা চাটিল্লপাদের ৫ সংখ্যক পদ।
চাটিল্ল পাদের এই পদটির রাগ 'গুর্জরী' এই গানে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্বর সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্বও আলোচিত হয়েছে। এই গানে অস্তিত্ব-প্রবাহকে নদী প্রবাহের রূপকের মধ্য দিয়ে পদকর্তা প্রকাশ করেছেন।

(৩) ভুসুকু পাদের ৬ সংখ্যক পদ।
ভুসুকুপাদের এই পদটির রাগ 'পটমঞ্জরী'। শিকারের রূপকে পদটির মধ্য দিয়ে অর্থাৎ হরিণ-হরিণী ও মৃগয়ার রূপকে চিত্তের দুই অবস্থা ও অবস্থান্তরের গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

(৪) শবর পাদের ২৮ সংখ্যক পদ।
এই পদটির রাগ 'বল্লাডি'। এই পদে নগরের বাইরের জীবনচিত্র শবর দম্পতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই দম্পতির প্রেম ও মিলনের রূপকে মহাসুখলাভের তত্ত্বটি পাদকর্তা তুলে ধরেছেন।

(৫) টেন্ঢন টেণ্টন'-পাদের ৩৩ সংখ্যক পদ।
পদটি প্রহেলিকাচ্ছন্ন যার ফলে দুর্বোধ্য। পরমার্থ তত্ত্ব সম্পর্কে যাদের ধ্যান ধারণা আছে, তারাই শুধু এর অর্থ সঠিক বুঝতে পারবেন।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (১ম সংখ্যক)

পইঠো—পুথিতে স্পষ্টভাবে 'পইঠো' লেখা আছে। পাঠান্তরে 'পইঠা' আছে। এখানে পুথির 'পইঠো' অর্থহীন বা অসংগত নয়।

সমাহিঅ—প্রাকৃতের প্রাচীন পদ বজায় আছে। পুথিতে 'সমাহিঅ' কথাটির মাঝামাঝি বন্ধনসূত্রের জন্য ফাঁক আছে। বর্তমানে সুতোর ঘসায় 'সমা' অংশটি নষ্ট হয়েছে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সময়ে 'স' অক্ষুণ্ণ ছিল, 'মা' নষ্ট হয়েছিল।

সুন্ন—পুথি লিপিতে 'ন্ন' ও 'নু' প্রায় একরূপ। এজন্য পাঠান্তর হয়েছে 'সুনু'। কিন্তু অন্যান্য চর্যাগীতির নিশ্চিত 'ন্ন'র সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় পাঠটি 'সুন্ন'।

ঝাণে—টীকার 'ধ্যানবশেন' পদ থেকে 'ঝাণে' পাঠের সমর্থন পাওয়া যায়। তিব্বতি অনুবাদেও 'ঝাণে' সমর্থন করতে দেখা যায়।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (৫ সংখ্যক) ঃ

গঢ়ই—চর্যায় 'ট' ও 'ঢ়' এর ছাঁদ প্রায় একরূপ। হয়তো সেই জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-'গটই' পাঠ করেছেন। তবে 'গঢ়ই' পাঠ ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অনেকটা সঠিক।

পটি—'পাটি' অক্ষরের লিপিভ্রম। ১৫

দিঠি—দিঢ়ি—'দিঢ়ি' নজিরবিহীন অক্ষর। অন্যান্য চর্যাগীতিতে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ক্রিয়া বিশেষণ রূপে 'দিঢ়' পদ আছে। এখানেও 'দিঢ়' পাঠই সঙ্গততর বলে মনে হয়।

কোড়িঅ—অর্থানুযায়ী—'কহিঅ' 'কাহিঅ' পাঠই যুক্তিযুক্ত।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (৬ সংখ্যক) ঃ মূল পদে আছে 'কাহেরে' আর পাঠান্তরে দেখা যায় 'কাহৈরি'। পদটির পর অসমাপিকা ক্রিয়া 'ঘিনি' আছে। এই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ বিভক্তিযুক্ত 'কাহৈরি' পদটি ব্যাকরণের দিক থেকে প্রযোজ্য নয় তাই পাঠান্তরের 'কাহৈরি' পাঠ অশুদ্ধ বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচারে মুনিদত্তের টীকায় দ্বিতীয় বিভক্তিযুক্ত যে 'কাহেরে' পদটি আছে সেটিই সঠিক ধরে নেওয়া যায়।

'হাক' ও 'ডাক' ঃ— মূল গীতিতে 'হাক'-পাঠান্তরে 'ডাক' রয়েছে। পুঁথিতে হা অক্ষরটি যেভাবে লেখা ছিল সেটি আধুনিক 'ডা' অক্ষরের মতো। মনে হয় এর জন্যই পাঠান্তরে 'ডা' আছে। কিন্তু পুথির অন্যান্য পদে 'ডা' ও 'হা' নিশ্চিত রূপ নিয়েই আছে। সেই সব অক্ষরের সঙ্গে তুলনা করলে—'ডা'-এর পরিবর্তে 'হা' হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

'হরিণী বোলঅ হরিণী সুণ হরিআতো'—এই চরণটি নিয়ে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে গবেষকদের মধ্যে। এর কারণ পাঠের অর্থ স্পষ্ট ও সুসংগত নয়। পাশাপাশি টীকা ও তিব্বতী অনুবাদ অনুযায়ী এই পদ্যাংশের একটি পৃথক ও অর্থের দিক থেকে সংগতিপূর্ণ পাঠের আভাস পাওয়া যায়।

প্রবোধকুমার বাগচী—টীকা ও তিব্বতী অনুবাদের সূত্র ধরে—'হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো'। পাঠটি গ্রহণ করেছেন। এই পাঠ অর্থের দিক থেকে পুথির পাঠের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়।

ভুসুকু অহেরী—পাঠান্তর ভুকু—অসাবধানতাবশতঃ লিপিকার হয়তো 'সু' অক্ষরটি লিখতে ভুলে গেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ভুকুঅহেরী' পাঠ গবেষকগণ ভুল পদবিশ্লেষণ বলে মনে করেন। এছাড়া 'ভুকু'র চেয়ে 'ভুসুকু' পাঠ ছন্দের দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য।

ছুবই—মূল পুঁথিকে স্পষ্টভাবে 'চ্ছুপই' লেখা আছে—কাজেই 'ছুবই'—এই পাঠশুদ্ধি অপ্রয়োজনীয়।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (২৮ সংখ্যক) ঃ

পুঞ্চআ—এখানে 'পুঞ্চআ' পাঠান্তর থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু 'ধনুআ' পাঠের প্রয়োজনীয়তা নেই।

উঞ্চা উঞ্চা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রবোধ কুমার বাগচীর গ্রন্থে—উঁচা-উঁচা আছে। এতে অর্থের বা ছন্দের কোন হেরফের ঘটে নি। পরিহিন—ড. শহীদুল্লাহের—'পরিহান'—ছিন্-ভিন্ ইত্যাদির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (৩৩ সংখ্যক) ঃ

টেণ্টন-'টেণ্টন' শব্দের অর্থ জুয়াড়ি, ধূর্ত। এখানে হয়তো ধূর্ত বা চতুর অর্থটি গ্রহণযোগ্য। এই গীতিতে চাতুর্যের পরিচয় আছে। 'টেণ্টনপাদ' হয়তো কবির ছদ্মনাম। চাতুর্যপূর্ণ প্রহেলিকাচ্ছন্ন পদ রচনা করতেন বলেই হয়তো এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। চর্যাপুথিতে 'ট' ও 'ঢ'-এর লিপি দেখতে একরূপ হওয়াতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. সুকুমার সেন, ড. শহীদুল্লাহ প্রমুখ ভাষাবিদ্গণ—'ঢেণ্ঢনপাদ' পাঠ নিয়েছেন। কিন্তু ড. নির্মল দাশ অর্থহীন বলে এই পাঠ গ্রহণে নারাজ। তাঁর মতে—'টেণ্টণ্টে'র অর্থানুযায়ী কর্পূরমঞ্জরী, দেশীনামমালা, বর্ণারত্নাকর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গাল, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গাল ইত্যাদি গ্রন্থে এই শব্দটির ধূর্ত, চতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তাঁর মতে 'ঢেণ্ঢন'-এর বদলে 'টেণ্টন' পাঠই গ্রহণযোগ্য।

বেগ-সংসার—পুঁথির 'বেগসংসার' পদ দুটির সঠিক পাঠ 'বেঙ্গসঁ সাপ।'

সঁসার—এই পদটির 'র' হরফটি চর্যার অন্যান্য গীতির 'র' থেকে সামান্য পৃথক দেখতে। সম্ভবত এটি 'র' নয় 'প'।

বিরলেঁ—পুথির 'বিচিরলেঁ'—লিপিকারের লিপিভ্রম বলে মনে হয়।

বড়হিল—'বধ্' ধাতুর অর্থ কাটা, ছেঁড়া। 'বড়হিলে'র অর্থ স্পষ্ট জানার জন্য 'চঢ়িল' পাঠ নিষ্প্রয়োজন।

৪১.৩.২ পদকর্তা পরিচিতি

লুইপাদ ঃ চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ে ২৪ জন কবির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া গেছে। কবি লুইপাদ সিদ্ধাচার্যদের আদি গুরু। 'লুই' শব্দটি "রোহিত" শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে মনে করে গবেষক প্রবোধচন্দ্র বাগচী কবিকে নাথ যোগীদের আদি সিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধাচার্যদের কাছে এঁরা অভিন্ন ব্যক্তি নন। চর্যাপদের টীকাকার মুনি দত্ত মীননাথের দোহা তুলে ধরে বলেছেন—"তথা চ পরদর্শনে মীন নাথঃ।" এ থেকেই বোঝা যায় লুইপাদ ও মীননাথ—দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি।

লুইপাদের ২টি চর্যাগীতি (১নং ও ২৯নং) চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ে পাওয়া যায়। গীতি দুটির পদ সংখ্যা, ছন্দ ও রাগিনী একই। দুটি পদেই দু'বার করে ভণিতা আছে। আলোচ্য পদটি ভালভাবে পাঠ করলেই দেখা যাবে ধ্রুব (দ্বিতীয়) পদে এবং শেষ পদে। লুইপাদ আদি পদকর্তা বলে সুচিহ্নিত। কবি দশম শতাব্দীতেই পদটি রচনা করেছেন বলে গবেষকদের ধারণা।

কবি পরিচিতি ঃ চাটিল্ল পাদ বা চাটিল পাদ (৫ম সংখ্যক) ঃ বিরুআ, গুণ্ডরী, বীণা প্রমুখ সাধক পদকর্তাদের মতো চাটিল পাদ বা চাটিল্ল পাদের একটি মাত্র পদ পাওয়া যায়। তবে এই একটি পদের মধ্য দিয়েই পদকর্তার কবি বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। তেঙ্গুর তালিকায় চাটিলের নাম নেই। তারানাথও কবির নাম উল্লেখ করেননি। জ্যোতিশ্বরের 'বর্ণরত্নাকরে' 'অথ চৌরাশী সিদ্ধ বর্ণনা'তে ৬৪তম সিদ্ধরূপে এজন 'চাটল' এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিনয়শ্রী সিদ্ধ নামের ক্ষেত্রে জনৈক 'চাটলা'কে স্মরণ করেছেন। চর্যাপদের ৫ পদসংখ্যার চাটিল পাদ বা চাটিল্ল পাদ আলোচ্য 'চাটাল' ও 'চাটলা'—বিভিন্ন ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো গবেষকের মতে তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, মতান্তরে বরিশাল জেলার (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) চন্দ্রদ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পদে নদীমাতৃক বাংলাদেশের যে জীবন্ত চিত্র আছে তাতে বরিশালের কবি বলে ধরে নেবার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় নেই বলে মনে হয়। কবির আবির্ভাব কাল নিয়ে স্পষ্ট মতামত এখনও পাওয়া যায়নি।

পদকর্তা পরিচিতি (৬ সংখ্যক) ঃ ভুসুকু পাদ রচিত আটটি চর্যাগীতি পাওয়া গেছে। গীতি রচনার সংখ্যার দিক থেকে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। তাঁর ৬ ও ২৩ সংখ্যক গীতিতে মৃগয়ায় রূপককে আশ্রয় করে সাধনতত্ত্বটি তুলে ধরেছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু ভুসুকুর ৪৯ সংখ্যক পদে বর্ণিত "বাজণার পাড়ী পঁউআ খালে বাহি উ" চরণের 'পঁউআ' খালকে বর্তমানের 'মহানদী' বা 'পদ্মানদী'র আদিরূপ বলে অনুমান করেছেন। ভুসুকুপাদকে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরের লোক বলে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া ভুসুকুর একাধিক পদে 'বঙ্গালী' শব্দটির প্রতিও গবেষকগণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশ ও জলপথে দস্যুবৃত্তির নানাচিত্রও ভুসুকুর লেখায় দেখা যায়।

পদকর্তা পরিচিতি (২৮ সংখ্যক) ঃ শবরপাদ—চর্যাগীতিতে মোট ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব নাম থেকে কবিদের সঠিক ব্যক্তি পরিচয় উদ্ধারে নানা অসুবিধা আছে। এর মূলে রয়েছে নাম উল্লেখের ব্যাপারে টীকাকারের কিছু কিছু ভুল। শবরপাদের নামে ২৮ ও ৫০ সংখ্যক গানে 'শবর' পদটি যেভাবে আছে তাতে তা ভণিতা বলে মনে হয় না, কিন্তু টীকায় পদটি কবিনাম হিসেবে উল্লিখিত। ড. সুকুমার সেনের মত অনুযায়ী চর্যা গীতিকায় যে সকল সিদ্ধাচার্যের নাম আছে তা থেকে দুটি নাম বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে 'বীণা' ও 'শবর' শব্দ দুটি যেভাবে আছে তা, ভণিতা বলে মনে হয় না। 'শবরীপাদ' নামে এক বা একাধিক সিদ্ধাচার্য ছিলেন। চর্যাগীতির প্রধান পদকর্তাদের মধ্যে লুইপাদ, ভুসুকপাদ, কাহ্নপাদ ও শান্তিপাদের পাশে শবরপাদের নামটিও উল্লেখযোগ্য।

পদকর্তা পরিচিতি (৩৩ সংখ্যক) ঃ বিরুআ (বিরূপ), চাটিল, বীণা প্রমুখ সিদ্ধাচার্য সহজপন্থী" কবিদের মতো টেন্টনপাদেরও মাত্র একটি পদ। 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে' সঙ্কলিত হয়েছে। পদ সংখ্যাতিত। মুসলমান অভিযানের পর বাংলাদেশে চর্যাগীতির ধারা অব্যাহত না থাকলেও বিলুপ্ত হয়নি। নাথপন্থী যোগীরা তাঁদের সাধারণ লেখার মধ্যেও চর্চাগীতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। পরবর্তিকালের ভাবুক যোগী ও বৈষ্ণবদের কিছু কিছু গানে চর্যাগীতির হুবহু অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি পুঁথিতে কবীবের ভনিতাযুক্ত আট ছত্রের একটি গীতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢেণ্ঢনপাদের গানে আছে দশ ছত্র। দু'জনের লেখায় চারছত্র ভাবে ভাষায় এক, অপর অংশ ভাষায় পৃথক।

ঢেণ্ঢন পাদের গীতের শেষাংশ হলো—

নিতে নিতে বিআলা ষিহেঁ সম জুঝঅ
ঢেণ্ঢনপাত্রর গীত বিরলে বুঝঅ।।

কবীরের গানের শেষাংশে দেখা যায়—

"নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে।"

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, চর্যাপদের ধারা মুসলমান আক্রমণের পরেও মরুপথে হারিয়ে যায়নি। পরবর্তী অধ্যাত্ম সাধক সম্প্রদায়ের হাতে চর্যাপদের ঐতিহ্যধারা কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। টেণ্টন পাদের পদটির অনুবৃত্তিই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

৪১.৪ বাচ্যার্থ

বাচ্যার্থ (১ম সংখ্যক) ঃ কায় (রূপ) তরুবর। তার পাঁচটি ডাল। চিত্ত চঞ্চল তার মধ্যে কাল প্রবেশ করেছে। দৃঢ়ভাবে মহামুখ পরিমানকর। লুই বলে, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে সব জান। সমাধি সকল দিয়ে কি হবে ; সুখ-দুঃখ নিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রত্যেককেই মরতে হবে। (এজন্য) ছন্দের (বাসনার) বন্ধন ও ইন্দ্রিয়ের পটুত্বের আশা ত্যাগ করো। শূন্যতার দিকে পাশ ফের। লুই বলে, আমার ধ্যানে, (পাঠান্তরে 'ইশারায়'—এই যুগনদ্ধ রূপ) দেখেছি। ধমন-চমন অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দুই পিঁড়িতে বসেছি।

বাচ্যার্থ (৫ম সংখ্যক) ঃ ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে বয়ে চলেছে। তার দুই তীর কর্দমাক্ত, মাঝখানটা অথৈ। চাটিল ধর্মের জন্য সাঁকো তৈরি করেছে। পারাপারের যাত্রীরা নিশ্চিন্তে পার হয়। মোহরূপ বৃক্ষ ফাড়া হলো, তার তক্তা জোড়া হলো, অদ্বয় টাঙ্গী নির্বাণে দৃঢ়ভাবে বিদ্ধ করা হলো, সেতুতে ডান-বাঁ হবে না। বোধি-কাছেই-দূরে যেয়ো না। ওহে, তোমরা যদি পরগামী হতে চাও তবে শ্রেষ্ঠ সাঁই চাটিলকে জিজ্ঞাসা করো।

বাচ্যার্থ (৬ম সংখ্যক) ঃ কাকে সঙ্গে নিয়ে কাকে বাদ দিয়ে কীভাবে আছি, চারদিক ঘিরে ধরে হাঁক পড়েছে। নিজের মাংসের জন্য হরিণ নিজেরই শত্রু হয়েছে। ভুসুকু একটু সময়ের জন্যও শিকার ছাড়ে না। হরিণ ঘাস স্পর্শ করে না, জলপান করে না। হরিণ হরিণীর বাসস্থান জানে না। হরিণ হরিণীকে বলে ; শোন, জুয়াড়ি তুই (পাঠান্তরে হরিণ হরিণীকে বলে—তুই শোন) এ বন ছেড়ে তুই পালিয়ে যা। ভীত-ত্রস্ত পালিয়ে যাওয়া হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলে, (এই পদের তাৎপর্য) মূর্খের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

বাচ্যার্থ (২৮ সংখ্যক) ঃ উঁচু উঁচু পাহাড়। শবরী বালিকা সেখানে বাস করে। তার পরনে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, ভুল করো না, একান্ত অনুরোধ (ও তোমার) নিজেরই সহধর্মিণী, ওর নাম সহজ সুন্দরী। বনের গাছ গাছালি মুকুলিত হ'ল। তাদের ডালপালা আকাশে ঠেকলো। কানে কুন্তল ও কণ্ঠে বজ্র ধারণ করে শবরী এই বনেই একাকিনী বসবাস করে। তিন প্রকার ধাতুর খাট ও মহাসুখের বিছানা পাতা হলো। শবর প্রেমিক, নৈরামণি প্রেমিকা। প্রেম মিলনে রাত কাটলো। গুরু বাক্য পুচ্ছ যুক্ত বাণ্। সেই তীরে নিজের মনকে বিদ্ধ কর। এক শরে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর। ভীষণ ক্রোধে শবর উন্মত্ত। পর্বতের শিখর সন্ধিতে আত্মগোপন করলে শবরকে কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে?

বাচ্যার্থ (৩৩ সংখ্যক) ঃ ঘন বসতিতে আমার ঘর (অথচ) পাড়া পরশি নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, (কিন্তু) ঘরে প্রতিদিনই অতিথির আগমন। ব্যাঙ সাপকে কাটে, কী আশ্চর্য, দোয়া দুধ আবার বাঁটে প্রবেশ করে। বলদ বিয়ায়—গাভী বন্ধ্যা। তিন সন্ধ্যা পাত্রে দুধ দোহন করা হয়। যা সেই বুদ্ধি—তা-ই-খারাপ বুদ্ধি। যে চোর সেই কোটাল। প্রত্যেক দিন শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ঢেণ্ঢনপা-এর গীত কদাচিৎ বোঝা যায়।

৪১.৫ গূঢ়ার্থ

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ঃ পদকর্তা লুইপাদ শরীরকে গাছের সঙ্গে তুলনা করে পঞ্চস্কন্ধ অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে গাছের শাখা স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন।

বিষয় বাসনায় চিত্ত চঞ্চল হয় বলেই আমরা সংসার জীবনে নানা দুঃখ ভোগ করে কাল কবলিত হই। কিন্তু এই চাঞ্চল্য দূর করে মহাসুখ লাভ করবার জন্য চিত্তকে দৃঢ় করতে হবে। গুরুকে জিজ্ঞাসা করে এসব জানতে হয়।

যোগ-ধ্যান-সমাধিছ ইত্যাদির দ্বারা দুঃখের প্রভাব থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু সমাধি ভঙ্গের পরই জাগতিক জ্ঞানের উদয় ঘটলেই আবার দুঃখ সাগরে পতিত হতে হয়। এই পন্থা চিরস্থায়ী মহাসুখলাভের প্রকৃত উপায় নয়।

আসলে বাসনার বন্ধন এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আশাই মানুষের যাবতীয় দুঃখের কারণ। এসব থেকে মুক্ত হতে না পারলে অর্থাৎ বাসনার নিবৃত্তি ঘটাতে না পারলে চিরকাল দুঃখে জীবন কাটাতে হবে। বাসনার নিবৃত্তিই মহা সুখলাভের প্রকৃত পথ।

এই বাসনার নিবৃত্তি কীভাবে হয়? যতদিন সংসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধ্যান ধারণা বদ্ধমূল থাকবে, ততদিন সংসার আমাদের মন প্রাণকে আকর্ষণ করবেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংসারের কোনো অস্তিত্ব নেই। সংসারকে 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' এর মতো ভ্রান্তিরূপেই দেখা হচ্ছে—এই ধারণা জন্মালেই সংসারের বন্ধন-আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সজীব-চিত্র এই পদে আছে। নদী পারাপারের জন্য সেতুর ব্যবহার—বংলার বুকে জীবন্ত। সহজ চিত্রকল্পের সাহায্যে সহজিয়া সাধক কবি সহজিয়া সাধনতত্ত্বটি এই পদে প্রকাশ করেছেন।

পার্থিব জগতকে কবি গহন-গভীর বেগবান নদীর সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন—

'ভবনই গহণ গম্ভীর বেঁগে বাহী'। উপমাটি সার্থক

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (৫ম সংখ্যক) ঃ

বিশ্ব সংসার নদীর মতো। নদীর বুকে যেমন দিনরাত ঢেউ উঠছে আবার নদীর বুকেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেইরূপ সংসারেও বিষয় বাসনার তরঙ্গ প্রতি মুহূর্তে মানুষের হৃদয় গভীরে জাগছে আবার পাওয়া-না পাওয়ার বেদনায় তা হারিয়ে যাচ্ছে। এইজন্যই পদকর্তা একে 'গহন' অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বলেছেন। প্রবহমান নদীর দুই তীরে যেমন কাদা জমে ঠিক তেমনি মানব-সংসারের দুই তীরও নানাদোষে দূষিত হয়। কলুষপূর্ণ এই 'ভবনদী' পার হওয়া খুবই কষ্টকর।

ঘট-লট-স্তম্ভ-কুম্ভাদির মতোই বৃতবিকারই ভব-সংসারের স্বাভাবিক ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে এর কোনো অস্তিত্বই নেই। বিষয় বিষে জর্জরিত চোখে এসব ধরা পড়ে না বলেই সিদ্ধাচার্য চাটিল সেতু নির্মাণ করেছেন। এই সেতুকে অবলম্বন করেই সাধক কবি 'ভবনদী' পার হতে বলেছেন। এই সেতু কীভাবে তৈরি হবে? এর উপায় চাটিল্লপাদ বলেছেন। মোহগ্রস্ত চিত্ত যাকে গীতিকার গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই চিত্তকে ফেঁড়ে গাছের পাট যেমন ফাঁড়ার পর পৃথক করা হয় ঠিক তেমনি চিত্তের বিষয় গ্রহকে খণ্ডিত করে জ্ঞানলোকের সঙ্গে তাকে জুড়ে দিতে বলেছেন। সবশেষে অদ্বয় জ্ঞানরূপ কুঠারের সাহায্যে নির্বাণকে সুদৃঢ় করে সেতু নির্মাণ করতে বলেছেন। সেতুতে চড়ে ডানে বামে অর্থাৎ বিমার্গে চলতে নিষেধ করেছেন। গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব ত্যাগ করে যদি চলা যায় তবে শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ ঘটবে।

মহামোহস্বরূপা এই ভবনদী যারা পার হতে ইচ্ছা করে তারা যেন অনুত্তর ধর্মস্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা করে।

শব্দার্থ ঃ—

ভবনই	—	বিশ্বসংসার।
গহন	—	ভয়ঙ্কর।
প্রান্তে	—	দুই তীরে, দুই ধারে।

চিখিল	—	পাঁক।
থাহী	—	থৈ।
ধামার্থে	—	ধর্মার্থে।
সাংকম্	—	সাঁকো।
গঢ়ই	—	গড়ি, তৈরি করি।
অদঅ	—	অদ্বয়।
নিয়ড্ডী	—	নিকটে।
হোইব	—	হবে।
পুচ্ছ	—	জিজ্ঞাসা করিও। ৩৩

এরূপ চিত্তকে ঘিরেই জরা-মৃত্যুশিকারীর দল ছুটে আসে। চরম বিপদ মুহূর্তে চিত্ত সঠক ঠিকানা খুঁজে পেয়ে ভোগ-সুখের জগত ত্যাগ করে। নির্বাণ-হরিণীকে পাবার জন্য আকুল হয়। নির্বাণ বা মহাসুখ হরিণীর রূপ ধারণ করে নির্বাণ লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্ত হরিণকে ঠিক পথের সন্ধান দেয়। সহজিয়া তত্ত্ব কথাটি ভুসুকুপাদ বাস্তব শিকারের পটভূমিকায় সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। পাদটির মধ্যে গীতি কবিতার মূর্চ্ছনাও খুঁজে পাওয়া যায়।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (৬ সংখ্যক) ঃ

চঞ্চল চিত্ত ভুসুকুপাদ নিজের চিত্তকেই হরিণের সঙ্গে তুলনা করে শিকারের উপমার সাহায্যে পরমার্থ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। শিকারিগণ চারদিক থেকে বন ঘিরে ফেলে হরিণকে মারবার জন্য সচেষ্ট। এই কঠিন পরিস্থিতিতে হরিণীর আহ্বানে সে তার মুক্তি সাধন করে চলে এসেছে।

হরিণ নিজের মাংসের জন্যই নিজের শত্রু হয়েছে। অর্থাৎ তার মাংসের লোভেই সকলে তাকে হত্যা করতে ছুটে আসে। ঠিক এইরূপ অবিদ্যা বিমোহিত চিত্ত হরিণ মদ-মাৎসর্যাদি দোষের জন্য নিজের সর্বনাশ সাধন করে। এসব বুঝেও ভুসুকু সদগুরুর নির্দেশ বাণে তাকে ধ্বংস করেন নাই। কিন্তু চরম বিপদ মুহূর্তে পান-আহার ভুলে অর্থাৎ জাগতিক ভোগ সুখ ত্যাগ করে বিপদশূন্য স্থানে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত। কিন্তু পথের সন্ধান পান না। কারণ তার সঙ্গিনী নৈরাত্মা দেবী রূপিণী হরিণীর নিরাপদ বাসস্থান ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, সেইজন্য ভোগ-সুখ বিভোর চিত্ত হরিণ তার সন্ধান করতে পারে নি।

এই পদটিতে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের তত্ত্বকথা থাকলেও মিলন উন্মুখ নর-নারীর প্রেমাকাঙ্খা যেভাবে কবি প্রকাশ করেছেন তাতে শাশ্বত প্রেমধর্মী সৃষ্টিরূপেও পদটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। ধর্মীয় তত্ত্বকে দূরে রাখলেও এর সাহিত্যিক মূল্য চিরন্তন। প্রেম ও প্রকৃতির সমন্বয়ে এই পদটিতে ভিন্নমাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (২৮ সংখ্যক) ঃ

মহাসুখচক্রে বজ্রধর শবরের সহজ গৃহিণী নৈরাত্মা দৈবী বাস করেন। এই মহাসুখ চক্র হ'ল কায়াকঙ্কালরূপ সুমেরু শিখর। শবরী অর্থাৎ নৈরাত্মাদেবী ময়ূর পুচ্ছ দিয়ে দেহকে সাজিয়েছেন, গলয় গুহ্য মন্ত্ররূপ গুঞ্জা ফুলের মালা পরেছেন। শবর প্রকৃতপক্ষে বজ্রধর। তিনি বিষয় বাসনায় মগ্ন, অন্যদিকে শবরী অর্থাৎ নৈরাত্মা ও প্রকৃতি

ভাব বিকল্পরূপ নানা অলঙ্কার পরিধান করে আত্মাগোপন করে আছেন। এই অবস্থায় দুই এর মিলন কীভাবে হবে?

এইপদে দেখা যায় শবরী সাধককে বিষয় বাসনায় উন্মত্ত শবরকে আশ্বাসবাণী শুনিয়ে বলেছে—'তুমি বিষয়ানন্দে মত্ত হয়ে আমাকে চিনতে ভুল করো না।' তার সাজসজ্জা দেখে ভুলবশতঃ পরস্ত্রী মনে হলেও শবরী নিজের পরিচিতি স্পষ্টভাবে দিয়ে বলেছে—'আমি সহজ সুন্দরী নামে তোমার নিজের গৃহিণী বা স্বরূপ প্রকৃতি। সুতরাং মিলন পথে দ্বিধা যেন না থাকে। শবরী তার দেহ সজ্জার বিস্তৃত কারণ ব্যাখ্যা করে অবিদ্যা প্রাপকের গভীরে তাকে অনুভব করতে বলেছে। শবরীর নির্দেশ ও আহ্বান মতো নৈরাত্মাকে লাভ করার জন্য শবর কায়বাক্‌চিত্তকে সুসংযত করে মহাসুখরূপ বিছানা পেতে চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করে নৈরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করে মহাসুখ ও জ্ঞানের আলোয় জীবনের ক্লেশ অন্ধকার রাত্রির পাথার পেরিয়ে শবরীর সঙ্গে মিলনানন্দে বিভোর হন।

সাধক এই চরম লগ্নে কীভাবে উপস্থিত হবে তার জন্য গুরুর নির্দেশের কথাও আছে। এই নির্দেশের মধ্যেই পরম নির্বাণ লাভের সঠিক নিশানা রয়েছে।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (৩৩ সংখ্যক) ঃ আমার ঘর টালির অর্থাৎ বস্তিতে আমার কোনো পড়শি নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্যই (প্রতিদিন) প্রেমিক অতিথি। বেঙ্গোর (বেগের) সংশয় বেড়ে যায়। দোয়া দুধ কী বাঁটে ঢোকে? বলদ বিয়লো (বাচ্চা দিল), গাই বাঁঝা (বাচ্চা প্রসব করে না)। তিন সন্ধ্যা পীঠ দোহন করা হয়। সেই যে বুদ্ধি (অর্থাৎ বলদের বুদ্ধি) সে সার্থক বুদ্ধি। যে চোর সেই পুলিশ। প্রতিদিন শেয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। টেণ্টন পাদের গীত খুব কম (লোকেই) বোঝে।

গূঢ়ার্থ ঃ এই চর্যাপদে অবাস্তব ঘটনার প্রহেলিকা মালাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে ঢেণ্ঢণপাদ সহজ সাধনা ও সহজ অনুভূতির আভাস দান করেছেন। কায়-বাক্ চিত্তের সব রকমের প্রকৃতিদোষ মহাসুখচক্রে লয় পাচ্ছে। সেই চক্রই আমার গৃহ চন্দ্র সূর্যের মতো প্রতিবেশী অর্থাৎ গ্রাহ্য গ্রাহকভাব লুপ্ত হয়েছে।

দেহের মধ্যে যে আমার চিত্ত নেই—তা গুরুর উপদেশ বুঝে এখন আমি সব সময় নৈরাত্মরূপে প্রবেশ করছি। অর্থাৎ কামনা-বাসনাময় ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে আমার বোধ লুপ্ত হওয়ায় এখন আমি সবসময় প্রভাস্বর শূন্যতায় প্রবেশ করছি।

নিরাবয়ব অর্থাৎ সর্বশূন্য এই সংসারের জ্ঞান আমার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—যার ফলে বোধিচিত্ত আশ্চর্যভাবে বজ্রাগার থেকে মহাসুখচক্রের দিকে যাচ্ছে।

সক্রিয় মন থেকে রূপজগতের সৃষ্টি হয় বলেই পদকর্তা বোধিচিত্তকে বলদ বলেছেন। এই বলদ প্রসব করে অর্থাৎ রূপ জগতের সৃষ্টি করে। আর এই চিত্তই যখন অচিত্ততায় লীন হয়ে নৈরাত্মাকে লাভ করে তখন রূপ জগতের দৃশ্যাদির জ্ঞানও লোপ পায় বলে নৈরাত্মাকে বন্ধ্যা বলা হয়েছে। কায়-বাক্ চিত্তের আভাসে গঠিত অবিদ্যা-পীঠ আমার দ্বারা তিনসন্ধ্যা অর্থাৎ সব সময় নিঃস্ব ভাবের মধ্যে লীন হচ্ছে।

বালযোগীদের স্বল্পজ্ঞান পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞেরা ঠিক মতো উপলব্ধি করেন না, কারণ, তাঁরা নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকেন। যে চিত্ত সবিকল্প জ্ঞান দ্বারা বিষয়সুখ অন্যায়ভাবে আহরণ করে তাকেই চোর বলা যায়। কারণ বিষয়ের সঙ্গে চিত্তের কোনো পরমার্থিক সম্বন্ধ নেই। এই চিত্তই নির্বিকল্পজ্ঞান লাভ করলে সাধু হয়।

দুঃখ, জরা-মৃত্যু ইত্যাদি ভয়ে ভীত সংসার চিত্তকে শৃগাল তুল্য। এই চিত্তই যখন বিশুদ্ধ হয় তখন সজ্ঞানস্বরূপ সিংহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়, অর্থাৎ তা আয়ত্ত করবার জন্য ব্যাকুল হয়।

টেণ্টণ পাদের এই গানের কোনো কোনো পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ লোক বুঝতে পারেন, সকলে বুঝতে পারেন না।

৪১.৬ সমাজ চিত্র

দেশ-কাল-সমাজকে দূরে রেখে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ অন্তরের গভীরতায় ধর্মের নিবিড় উপলব্ধির-জগতে পৌঁছতে চেয়েছেন। চর্যাকারগণের দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্বের দিক থেকে ছিল জীবনবিমুখ। জগৎ জীবন মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা জীবনের নানা লৌকিক রূপের উপরই বেশি নির্ভর করেছেন। তাই প্রত্যক্ষভাবে জীবনকে স্বীকার করলেও পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই চর্যাপদে আমরা সমাজ ও জীবনের রূপচিত্র পাই তা পরোক্ষ-খণ্ডিত ও আভাস ইঙ্গিতময়। সিদ্ধাচার্যগণ অমূর্ত উপলব্ধিকে রূপ দিতে গিয়ে নানা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আর এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন নদীমাতৃক বাংলাদেশের লোকজীবন থেকে।

বাংলাদেশে সেন রাজাদের যখন আধিপত্য, তখনই চর্যার গানগুলি রচিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজাগণ পরধর্মে অসহিষ্ণু ছিলেন। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত আর বেদধর্ম ও বেদাচারের বাইরের জনগোষ্ঠী ছিল অস্পৃশ্য অন্ত্যজ। এই তাত্ত্বিক ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে চর্যাপদ রচিত।

চর্যাগীতির রচয়িতাগণ ডোম্বী, কামলি, শবর ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণির লোক এবং চর্যাগীতির ডোমনী, শবর, চণ্ডালী, ব্যাধ, জেলে, ধুনুরী ইত্যাদি পাত্র-পাত্রীও অস্পৃশ্য শ্রেণির। সামাজিক বিভাজনের স্পষ্ট রূপরেখা কাহ্ন পাদের চর্যাগীতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সে ব্রাহ্মণ নাড়িআ।"

উচ্চবর্ণের লোকেরা নগরে বাস করতো, আর ডোম, শবর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকজন নগরের বাইরে—জনপদ থেকে বহুদূরে পাহাড়ে, জঙ্গলে মালভূমিতে বাস করতো। এদের স্পর্শে ব্রাহ্মণ্য সমাজ যাতে কলুষিত না হয় সেজন্যই শ্রেণি বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা। মহাসুখ বা সহজানন্দের রূপকরূপে—ডোমনী, শবরী ইত্যাদি নারী চরিত্র চিহ্নিত হয়েছে। এই রূপক ব্যবহারের মধ্যেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্পর্শ যোগ্যতার ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্ত্যজ শ্রেণির আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। নানা বৃত্তিনির্ভর নিম্নবর্ণের জীবনচিত্র সজীবরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ডোম, ব্যাধ, শুঁড়ি, তাঁতী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর জীবন্ত-জীবিকা প্রকাশে তাঁত বোনা, চাঙ্গাড়ি তৈরি করা, খেয়া পারাপার করা, শিকার করা ইত্যাদির পরিচয় আছে।

ডোম্-ডোমনীর নৌকা বাওয়া, নদী-নালার বুকে সেতু তৈরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নদীবক্ষে ডাকাতি ইত্যাদির বর্ণনায় নদী ও নৌকা প্রসঙ্গ আছে। ৫ সংখ্যক পদে চাটিল্লপাদ বলেছেন—

"ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহী।।

দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।।"

এর সঙ্গে 'সাঙ্কম গঢ়ই'ও আছে। নদী পারাপারের পারিশ্রমিক রূপে যৎসামান্য 'কড়ি' বা 'বুড়ি' ডোমজাতি পেতো। ডোম পুরুষেরা কাপালিক বেশে পায়ে নূপুর ও কানে কুণ্ডল পরে নাট্যগীতি করেও অর্থ উপার্জন করতো। এছাড়া মদ চোলাই করা (৩), শিকার করা (৬,২৩) কাঠের কাজ করা (৫,৪৫), তুলা ধোনা, মোটা কাপড় বোনা (২৬,২৫) ইত্যাদি কাজেও অন্ত্যজ শ্রেণি যুক্ত ছিল।

আপনাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ৫ সংখ্যক পদে নৌকো পারাপার, সেতু নির্মাণের কথা আছে।

'পার গামিলোঅ নিভর তরই' 'ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ'—ইত্যাদি চরণ এর দৃষ্টান্ত। ভুসুকুপাদের ৬ সংখ্যক পদে হরিণ শিকারের বাস্তব বর্ণনা—

'কাহেরে যিনি মেলি অচ্ছ হু কীম।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।।'

দারিদ্র্যলাঞ্ছিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবন চিত্র টেণ্টণপাদের ৩৩ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়।

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি, নিতি আবেশী।।"

পেটের জ্বালায় কেউ কেউ পদ্মের ডাঁটা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। কেউ বা অভাবের তাড়নায় চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য হতো চুরির ভয়ে ঘরে তালা লাগানোর কথাও আছে।

৩৩নং পদে এর দৃষ্টান্ত আছে।

"জো সো চৌর সৌ দুষাধী।" এছাড়া ২,৩৮,৪৯ সংখ্যক চর্চা গীতিতেও চুরি ডাকাতির প্রসঙ্গ আছে। চর্যায় গার্হস্থ্য জীবন যাপনের জীবন্ত চিত্র আছে। যৌথ পারিবারিক কাঠামো দেখা যায়। শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-শালী-স্ত্রী-পুত্রবধূ (বহুড়ী) নিয়ে যৌথ সংসার। স্বেচ্ছাচার ছিল না। গৃহবধূ শাশুড়ীকে ভয় পেতো। এছাড়া নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচয় আছে—যার সঙ্গে আধুনিক বাঙালী সমাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনায় এর পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কাহ্নপাদের ১৯ সংখ্যক পদে বিবাহ যাত্রার সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

"জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।।"

শবর পাদের ২৮ ও ৫০ সংখ্যক চর্যায় আদিবাসীদের দাম্পত্য জীবনের স্পষ্ট চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে প্রমোন্মত্ত শবর-শবরীর মিলনসুখের পাশাপাশি মান-অভিমানের চিত্রও আছে। ২৮ সংখ্যক পদে দেখা যায় ভুলের অবসান হলে উন্মত্ত শবরকে শবরী অনুনয় করে বলে—

"উমত সবরো পাগল শবরো মাকর গুলী-গুহাড়া তো হৌরী।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।"

ব্যবহারিক জীবনে হাঁড়ি, ঘড়া, গাড়ু ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। মেয়েরা আয়না, কাঁকন, কুন্তল ইত্যাদি ব্যবহার

করতো। ধনী ব্যক্তিরা খাটে শুয়ে কর্পূর মেশানো পান খেতো। সমাজ জীবনে মদের আসক্তি ব্যাপক ছিল। যার ফলে মদ চোলাইয়ের ব্যবসা রমরমা ছিল। বিরুআর ৩ সংখ্যক চর্যায় শুঁড়িবাড়ির বিশেষ বর্ণনা আছে।

চর্যাগীতিতে উল্লিখিত রাগ-রাগিনীর নাম, বাদ্যযন্ত্র ও নাচগানের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়—চর্যার যুগে নাচ-গানের প্রাধান্য ছিল। কাহ্নপাদের পদে নাচ-গান ও নাটকের কথা আছে।

"একসো পদুমা চৌসঠ্ঠী পাখুড়ী।
তাই চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।"

নাটগীতির পালায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করতো।

সব দিক থেকে আলোচনা শেষে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি সাধক কবিগণ অধ্যাত্মপথের যাত্রী হয়েও সমাজ জীবনের মূল স্রোত ধারার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছিলেন, তার জন্যই বাংলার প্রান্তিক-ভূখণ্ডের জীবন্ত সমাজ চিত্র চর্যাগীতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

৪১.৭ অধ্যাত্ম ভাবনা

চর্যাগীতিতে যে ধর্ম সাধনার ইঙ্গিত আছে, তা প্রধানত সহজযান বৌদ্ধধর্মের। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের গূহ্য সাধন সংকেতই রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। মহাযান মতবাদ বিবর্তিত হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজ যান ইত্যাদি নানা ভাগের সৃষ্টি।

বজ্রযানীদের মতো মন্ত্র-তন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনা, পূজা-আচার অনুষ্ঠানে সহজযানীদের বিশ্বাস ছিল না। গুরু নির্দেশিত গূহ্যপথ ধরে কায়া সাধনায় ব্যক্তিগত মুক্তি ও সিদ্ধির প্রতিই এদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সহজয়ানীদের ধর্ম সাধনায় 'সহজ' শব্দটি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দুটি সার্থকতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একটি হ'ল এই ধর্ম সাধনার সাধ্য সহজ এবং অপরটি হ'ল সিদ্ধাচার্যদের সাধনপদ্ধতি বক্র নয়—সহজ (জন্মের সহিত জাত) দেহ। অন্যান্য সাধকেরা ধ্যান-জপ-তপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করে মুক্তির সন্ধানী হয়েছেন। কিন্তু চর্যার গীতিকারগণ সহজ দেহের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা না করে, ধ্যান-সমাধির ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন। আপনাদের পাঠ্য তালিকার লুইপাদের ১ম সংখ্যক পদে তার পরিচয় আছে।

"স অল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখে দুখেতে নিচিতি মরি অই।।"

প্রায় একই সুর ধ্বনিত হয়েছে ২৯, ৩৪, ৪০ সংখ্যক পদেও। আগম পুঁথি সবই মিথ্যা, ইন্দ্রিয়গোচর ও গ্রাহ্য সব কিছুই নিষ্ফল। কিন্তু সহজানন্দ ইন্দ্রিয় গোচর নয়। চর্যার 'সহজ' ও 'সহজলাভের' ঋজু পথ—সাধারণ মানুষ জানেনা। এই দুই এর সঠিক পরিচয় একমাত্র গুরুর কাছে পাওয়া যাবে। তাই চর্যার কবি বলেছেন—

"গুরু পুচ্ছিঅ জান।"

চর্যাগীতিতে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে সহজিয়া ধর্মের সাধনপ্রণালী অনেকটা প্রাধান্য পেয়েছে। তন্ত্রে ধর্ম সম্পর্কে কোনো

নতুন তত্ত্ব প্রমাণের চেয়ে সত্যলাভের সহজ সাধন পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সিদ্ধাচার্যগণ। তন্ত্রের বহিরঙ্গের বিষয়গুলি দূরে রেখে মূল সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তন্ত্রের মূল সাধনা 'কায়া সাধনা'। সহজিয়া সাধকগণও তাঁদের ধর্মীয় প্রধান তত্ত্বাদি এই দেহের ভিত্তিতেই প্রতিবাদন করেছেন। 'বোধিচিত্ত' বা 'মহাসুখ'কে পরম সত্য ও কামনার বিষয়রূপে সিদ্ধাচার্যগণ গ্রহণ করেছিলেন। 'প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা' ও 'উপায় রূপিণী করুণা'কে সাধনার দ্বারা যদি একাত্ম করা যায় তবেই এই 'মহাসুখ' লাভ সম্ভব।

এই মহাসুখ, শূন্যতা ও করুণার তত্ত্ব সহজিয়া সাধকগণ দেহের নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উপর স্থাপন করে দেহের চারটি চক্রের কল্পনা করেছেন। সেগুলি হ'ল—(১) 'নির্মাণ চক্র'—এই চক্র নাভিতে, (২) 'ধর্মচক্র'—হৃদয়ে, (৩) সম্ভোগচক্র—কণ্ঠে (৪) 'সহজচক্র' বা 'মহাসুখচক্র'—মস্তকে অবস্থিত। এই চারটি চক্রের মধ্যে 'সহজচক্র'ই 'বোধিচিত্তে'র প্রকৃত স্থান। এইসব চক্রের পাশাপাশি তিনটি প্রধান নাড়ীকেও সহজিয়া সাধকগণ সাধনার সাহায্যরূপে চিহ্নিত করেছেন। এই নাড়ী ৩টি হলো—(১) বাম নাসিকা ছিদ্র থেকে প্রবাহিত 'বামগানাড়ী'—এটি 'প্রজ্ঞারূপিণী', (২) ডান নাসিকাছিদ্র থেকে প্রবাহিত 'দক্ষিণগানাড়ী' যা 'উপায়রূপিণী' এবং (৩) নাসিকার বাম ও ডান ছিদ্রের দুই নাড়ীর মাঝখান দিয়ে 'মধ্যগানাড়ী'—'অবধূতিকা' প্রবাহিত। এই 'মধ্যগানাড়ী'-ই অদ্বয় বোধিচিত্ত সাধনার প্রধান অবলম্বন। পূর্বালোচিত চক্র ও নাড়ীর নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমে সহজানন্দ, মধ্য মার্গে আনন্দনুভূতি দেখা দেয়। বোধিচিত্তের চারটি চক্রের মতোই 'আনন্দানুভূতির'ও চারটি স্তব আছে। সেগুলি ক্রমানুসারে 'আনন্দ', 'পরমানন্দ', 'বিরমা-নন্দ' ও 'সহজানন্দ'। 'বিরমানন্দে'র অর্থ হ'ল—পার্থিব ভোগ-সুখের বিরাম, আর 'সহজানন্দের অর্থ হ'ল আত্যন্তিক আনন্দ।

আলোচিত এই সাধনতত্ত্বই চর্যাগীতিকারগণ নদী, বৃক্ষ ইত্যাদি নানা রূপকের আবরণে তুলে ধরেছেন।

৪১.৮ কাব্য মূল্য

সাহিত্য জীবনের দর্পণ। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনায় জীবনের অস্তিত্বহীনতাই মুখ্য। এজন্য চর্যাগীতিকার জীবনের প্রতি বিপুল আগ্রহ ও জীবনের বিস্তৃত পটভূমিকা প্রত্যাশা করা যায় না। তবু পদগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন জীবনের রূপরেখাও জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'তত্ত্বকথা' নৌযাত্রা, দাবাখেলা, শিকার, মদচোলাই, নদী-পারাপার ইত্যাদি লৌকিক উপমানের সাহায্যে যে চর্যাগীতিগুলি রচিত হয়েছে তার মধ্যে সমাজজীবন ও তার পরিবেশ পটভূমি জীবন্তরূপ পেয়েছে। জীবনের সুখ-দুঃখ, সংরাগ-বিরাগের সামান্য ছোঁয়াও আছে। এই সব গানে জীবনরসের সজীবতাও লক্ষণীয়। বিষাদ ও শৃঙ্গার রসাত্মক গানগুলিতে এবং সামাজিক অন্যায় অত্যাচার, সংসার জীবনের অসঙ্গতি, নিরাপত্তার অভাব, চুরি, ডাকাতি, দস্যুবৃত্তির ফলে অসহায় মানুষের অসহায়তার রিক্ত চিত্র যে সব চর্যাগীতিতে আছে তা মানবিক অনুভূতি স্নাত।

ভুসুকু পাদের ৪৯ সংখ্যক পদে মানুষের রিক্ত অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

"বাজণাব পাড়ী পঁউআ ঘাঁলে বাহিউ।
অদ অ দঙ্গালে দেশলুড়ি উ।"

সংসার জীবনের চরম-বিপর্যয়ের চিত্রটি।

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।" —অংশে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিত্র ব্রাহ্মণ্য-শাসিত জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদিও চর্যাগীতিতে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জাতিভেদ প্রথার অর্থহীন দিকটি কাহ্ন পাদের লেখায় তীব্র ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ হয়েছে—

"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ম নাড়িআ।"

সামাজিক ভ্রষ্টাচারও কুক্কুরী পাদের পদে ব্যঙ্গাবাণে জর্জরিত—

"দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামুর জাঅ।।"

কাব্যরূপ ঃ চর্যাকার ও টীকাকারদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী চর্যার গানগুলি 'চর্যা' বা 'চর্যাগীতি' নামে চিহ্নিত হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বলে গবেষকগণ মনে করেন। কাঠামোগত দিক থেকে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী কঠোর অনুশাসন চর্যাপদে না থাকলেও সেকালের সমসাময়িক সঙ্গীত সম্পর্কিত গ্রন্থাদির মধ্যে সেকালের প্রচলিত কাঠামোই যে চর্যাপদে আছে সে সম্পর্কে তথ্যাদি জানা যায়। 'মানসোল্লাস' 'সঙ্গীত রত্নাকর'—গ্রন্থে চর্যার আকারগত কাঠামোর কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

সঙ্গীত রত্নাকরে চর্যার লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'প্রতিপদের শেষে অনুপ্রাসযুক্ত, পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত, আধ্যাত্মিক বিষয়ীকৃত, দ্বিতীয় প্রভৃতি তালযুক্ত গীতি তাকে চর্যা বলা হয়।" (বাংলার সঙ্গীত)

ড. সুকুমার সেন মানসোল্লাসের ও 'চর্যাপ্রবন্ধে'র নমুনাকে তাঁর 'চর্যাগীতি পদাবলী'তে তুলে ধরে বঙ্গানুবাদ করেছেন "অর্থ অধ্যাত্ম বিষয়ক, মিল আছে, দুই-তিন জোড়া ছত্র। দ্বিতীয় অংশেও এমনি। তাহাকে বলে চর্যা।"

চর্যাগীতিতে ১৪, ১২, ১০, ৮ চরণের গীত আছে। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় সনেটের নির্দিষ্ট চরণ সংখ্যা এতে নেই। অর্থাৎ চরণ সংখ্যার ব্যাপারে কঠোর নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম দেখা যায় না। 'ভনিতা' প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। রূপক ব্যবহারে মোটামুটি ঐক্য দেখা যায়। চর্যাগীতির রূপ বৈশিষ্ট্যই মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ধারায় গ্রহণ করতে দেখা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ কাব্য ও মঙ্গল কাব্যধারা এর সাক্ষ্য বহন করছে।

ছন্দ ঃ চর্যাগান রচনার সময় চর্যাকারদের সামনে (১) অভিজাত সংস্কৃত ছন্দ এবং (২) লৌকিক অপভ্রংশ ছন্দের আদর্শ ছিল। পদকর্তাগণ সংস্কৃতের ছান্দসিক আদর্শ গ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয় আদর্শের বিচিত্ররূপ থেকে কিছুটা উদারপন্থী নীতি নিয়ে 'পাদাকুলক' ছন্দে চর্যাগান রচনা করেছেন। এই ছন্দে লঘু-গুরু অক্ষরের স্থাপনার ব্যাপারে কঠোর কোনো নিয়ম নেই। চর্যাগীতির ৩৬টি গানই এই ছন্দে রচিত। তবে প্রতিটি গানে ৪+৪+৪+৪ = ১৬ মাত্রার 'পাদাকুলক' ছন্দের আদর্শ রক্ষিত হয়নি। যার ফলে কোনো কোনো চরণে মাত্রার সংখ্যা ১৫ কিংবা ১৪ ও পাওয়া যায়। নিখুঁত পাদাকুলক ছন্দের নিদর্শন—

"দুলি দুহি / পিটা // ধরণ ন / জাই। ৪+৪+৪+৪
রুখের / তেন্তলি // কুম্ভীরে / খা অ।।" ৪+৪+৪+৪

চর্যাকারগণ প্রকৃত রূপ-সচেতন ছন্দশিল্পী ছিলেন না। তত্ত্বকথায় গভীর মনঃসংযোগের ফলে ছান্দসিক প্রকরণে কিছুটা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। অলংকার, সন্ধ্যা ভাষা ও প্রহেলিকাময় তত্ত্বকথার দিকে তাঁদের নজর বেশি ছিল। তবে অপভ্রংশের বন্ধন থেকে ছন্দ ব্যবহারে যে শিথিলতা চর্যাকারগণ দেখিয়েছেন তার পথ ধরেই পরবর্তিকালে বাংলার নিজস্ব পয়ার ত্রিপদী ছন্দের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে।

অলঙ্কার ঃ প্রাচীনতম অলঙ্কারের ঐতিহ্যমুক্ত অলঙ্কার প্রয়োগ করে চর্যাকারগণ সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সহজিয়াতত্ত্ব প্রকাশের জন্য তাঁরা সতর্কভাবে শব্দালঙ্কার ব্যবহার করেছেন। শব্দালঙ্কারের ক্ষেত্রে 'শ্লেষ' অলঙ্কারই দেখা যায়। যেমন শাসু (৪, ১১)—(১) শাশুড়ী, (২) শ্বাস, হরিণী (৬)—(১) মৃগী, (২) নৈরাত্মা দেবী, কুম্ভীর (২)—(১) প্রাণী অর্থে, (২) কুম্ভকযোগ ইত্যাদি।

এইসব দৃষ্টান্তে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—দুই প্রকার অর্থই আছে। যার ফলে সন্দেহে এই শব্দগুলিকে শ্লেষ অলঙ্কার বলা চলে।

চর্যাগীতিতে অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য আছে। তার মধ্যে রূপক, প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, উপমা, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রচুর উদাহরণ আছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হলো।

(১) দৃষ্টান্ত অলংকার—

"আইএ অণুঅনা এ জগরে ভাংতিএমো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই।।"

এখান উপমেয়—'আইএ অণুঅনা এ জগরে'—অর্থাৎ আদৌ অনুৎপন্ন জগৎ এবং উপমান—'রাজসাপ' অর্থাৎ 'রজ্জুসর্প'—দুটি পৃথক স্বাধীন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপমেয় ও উপমানের ধর্ম ও পৃথক কিন্তু ভাব সাদৃশ্যে উভয় ধর্মই বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন সাধারণ ধর্মে পরিণত হয়েছে এই উদাহরণে।

রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কার ঃ

'অপণা মাংসে হরিণী-বৈরী, বর সুণ
গোহালী কিমো দুধ্য বলঙ্গে'—ইত্যাদি

লোক প্রবাদগুলি আসলে উপমান ও উপমানের অন্তরালে যে তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে—তাই উপমেয়।

রূপক ঃ চর্যাপদে রূপক অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রূপকে উপমানই উপমেয়ের চেয়ে প্রবল। কিন্তু এই প্রাবল্যের হের-ফেরের জন্য রূপকাশ্রিত চর্যাগুলিকে (১) উপমেয়—প্রবল, (২) উপমেয়—উপমান সমান, (৩) উপমান প্রবল—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

রূপকের দৃষ্টান্ত ঃ

'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল',
ভবন গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী',
ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ' ইত্যাদি।

দেহকে গাছের, সংসারকে নদী, মোহকে তরুর সঙ্গে অভেদ কল্পনা করে রূপক অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। চর্যাগীতিতে গীতের প্রয়োজনেই অলঙ্কার প্রয়োজন হয়েছে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত, সুখ-দুঃখাশ্রিত

সংসার জীবন, সমাজ পরিবেশ ও লৌকিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চর্যাকারগণ উপমানের উপাদান সংগ্রহ করে অর্থালঙ্কারের মালা গেঁথেছেন। তবে সেই অলঙ্কার কোথাও ভার বোঝা হয়নি বরং কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ড. নির্মল দাসের ভাষায়—"যে গানে অলঙ্কারের পরিমাণ যত বেশি বিচিত্র ও বহু ব্যাপক, সেই গানের কাব্যোপযোগিতাও তত বেশি। সুতরাং অলঙ্কারের মূল্যেই চর্যার কবিত্ব, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।"

৪১.৯ শব্দার্থ, টীকা, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য

শব্দার্থ (১ম সংখ্যা) ঃ

কাআ	—	কায়, দেহ
কাল	—	সময়
চিত্র	—	চিত্ত
পইঠো	—	প্রবেশ করিল
দিঢ়	—	দৃঢ়, শক্ত
মহাসুহ	—	মহাসুখ
পরিমাণ	—	প্রমাণ বা পরিমাণ করা
ভণই	—	বলে
পুছে	—	জিজ্ঞাসা করে
পুছিঅ	—	জিজ্ঞাসা করিও
জান	—	জানো
করি অই	—	করা হয়
সুখ দুখেতেঁ	—	সুখে-দুঃখে, সুখ দুঃখের দ্বারা
নিচিত	—	নিশ্চিত
মরি আই	—	মারা পড়ে
এড়ি এউ	—	ছাড়া হোক
ছান্দক	—	ছন্দের, অর্থাৎ বাসনার
বান্ধ	—	বন্ধন
করণক	—	ইন্দ্রিয়াদির
পাটের	—	পটুতার
আস	—	আশা
সুনুপাখ	—	শূন্যরূপ পাখা
ভিতি—পাঠান্তরে ভিড়ি	—	দৃঢ়ভাবে
চমন	—	রেচক, অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ
পাস	—	পার্শ্ব
বইঠা	—	বসা

শব্দার্থ (৫ম সংখ্যা) ঃ

বেঁগে	—	গতিতে
চিখিল	—	কর্দমাক্ত
থাহী	—	থৈ
ধামার্থে	—	ধর্মের জন্য
সাঙ্কম	—	সাঁকো
জোড়িঅ	—	জোড়া হ'ল
দিঢ়	—	শক্ত
ফাড্ডিঅ	—	ফাড়িয়া
আদঅ	—	অদ্বয়, চিরন্তন
পারগামী	—	পারাপারের লোকজন
লোহ	—	লোক
নিয়ড্ডী	—	নিকটে

শব্দার্থ (৬ সংখ্যা) ঃ

কাহারে	—	কাকে
ঘিনি	—	ঘিরে
অচ্ছহ	—	যুক্ত আছি
কিস	—	কিসে
বেঢ়িল	—	বেড় দিল
চৌদীস	—	চারদিকে
আপণা	—	নিজের
বৈরী	—	শত্রু
খনহ	—	ক্ষণমাত্র
অহেরী	—	শিকারী
তিন	—	তৃণ
চ্ছু লই	—	স্পর্শ করা
পিবই	—	পান করা
পাণি	—	জল
নিলঅ	—	বাসভূমি
বোলঅ	—	বলে
তো	—	তুমি

দীসঅ	—	দেখতে পাওয়া
ভণে	—	বলে
পই সই	—	প্রবেশ করে

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

ঘিনি/ঘেনেলি	—	স্বরসঙ্গতি
খনহ	—	পদমধ্য-হ-ধ্বনির উচ্চারণ সংরক্ষণ
ভুসুকু ভণই	—	মুখ্য কারকে শূন্য বিভক্তি
পড়অ	—	অপভ্রংশ-অবহট্ঠের মতো 'অ' স্বর সংযোগ
ছাড়অ	—	ঐ
অচ্ছহু	—	বর্তমান অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে বহুবচন বিভক্তি 'হু'

শব্দার্থ (২৮ সংখ্যক) ঃ

উঁঞা উঁঞা	—	উঁচু-উঁচু
পাবত	—	পর্বত
মোরঙ্গী	—	ময়ূরাঙ্গিক
পীচ্ছ	—	পুচ্ছ
গিবত	—	গলায়
মৌলিল	—	মুকুলিত হ'ল
হিণ্ডই	—	ঘুরে বেড়ায়
দারী	—	নাগরী
কাপুর	—	কর্পূর
পঞ্চআ	—	বাণের পুচছ
লোড়িব	—	খোঁজা হবে

শব্দার্থ (৩৩ সংখ্যক) ঃ

টালত	—	বস্তিতে
পড়িবেষী	—	পাড়া-পড়শি, প্রতিবেশী
নিতি	—	নিত্য, সর্বদা
আবেশী	—	অতিথি
বড়্হিল	—	বাড়িল
জা-অ	—	যায়
দুহিল	—	দোয়া

বেণ্টে	—	বাঁটে
সামায়	—	ঢোকে
বিআঅল	—	প্রসব করলো
গাবিআ	—	গাভী
বাঁঝেঁ	—	বাঁঝা
পিটা	—	পীঠে
সাঁঝে	—	সন্ধ্যায়
বুধী	—	বুদ্ধি
জো-সো	—	সেই যে
ষিআলা	—	শেয়াল
ষিহে	—	সিংহের
জুঝঅ	—	যুদ্ধ করে
বুঝঅ	—	বোঝে

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

টালত	—	স্থানাধিকরণ
হাঁড়ীত	—	আধারাধিকরণ
মোর	—	সম্বন্ধপদ
সাঁঝে	—	কালাধিকরণ
বুঝঅ	—	অপভ্রংশ-অবহট্ঠের মতো 'অ' স্বরসংযোগ
সাঁঝ	—	সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ নাসিক্যী ভবন
দুহিত্র	—	দুহিএ < দুহ্যতে - ভাববাচ্য

শাব্দিক টীকা (১ সংখ্যক) ঃ

সমাহিঅ—সং সমাধ্যা > প্রাঃ সমাহিঅ

পুচ্ছিঅ—পৃচ্ছ + ক্ত = পৃচ্ছিতঃ (= পৃষ্টঃ) > পুচ্ছিঅ

ভিড়ি—√ভিড্ (দেশী) + ইত > ভিড়িঅ > ভিড়ি

বইঠা—উপবিষ্টঃ > বইট্ঠ > বইঠা

আম্হে—অস্মাভিঃ > অম্হাহি > অম্হহি > অম্হে

দিঠা—দৃষ্ট > দিট্ঠ > (দীঠ) দিঠা

শাব্দিক টীকা (৫ সংখ্যক) ঃ

বেগেঁ < বেগেন

চিখিল < অবহট্ঠে 'চিখিল্ল'

'গাথা সপ্তশতী'তে 'কাদা' অর্থে 'চিক্খল্ল' ও 'চিক্খিল্ল' পদটি পাওয়া যায়।

থাহি—স্থাঘ + ইক = স্থাঘিক > থাহিঅ > থাহী

গঢ়ই—গ্রথতি > গঢই > গঢ়ই

চর্যাপদে 'ট' ও 'ঢ়' এর ছাঁদ প্রায় একরূপ। এর জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'গটই' পাঠ করেছেন, তবে অনেকের মতে 'গঢ়ই' পাঠই অনেকটা ভাষাতত্ত্ব সম্মত।

জোড়িঅ—'যুক্ত'-জাত প্রাকৃত ধাতু।

জোড + ইঅ (সংস্কৃত ক্ত-জাত) > জোডিঅ > জোড়িঅ।

সাঙ্কমত = সংক্রম > সাঙ্কম + ত (< অন্তঃ), সাঁকোতে।

নিয়ড্ডী—নিকট > ণিঅড + হি > নিঅড্ডি > নিয়ড্ডী।

তুম্হে—*তুষ্মাভিঃ (= যুষ্মাভিঃ) > তুম্হহি > তুমহে।

সামী > স্বামী।

শাব্দিক টীকা (৬ সংখ্যক) ঃ

কাহেরে—কস্য > কাহ + এরে।

ঘিনি—*গৃহ্নিত (= গৃহীত) > ঘিণিঅ > ঘিনি।

মেলি—সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি 'মেল্ল' + ইতা (সংস্কৃত-ক্ত প্রত্যয়জাত) > মিল্লিঅ > মেলি।

কীস—কী দৃশ্ > কীস। অথবা—কস্য > কিস্স > কীস।

বেঢ়িল—বেষ্টিত > বেড্টিঅ > বেঢ়িঅ + ইল্ল > বেঢ়িল।

শাব্দিক টীকা (২৮ সংখ্যক) ঃ

গুলী—*ঘূর্ণ > ঘুল্ল > গুল্ল > গুল + ঈ = গুলী।

ছাইলী—ছাদিত > ছাইঅ + ইল = ছাইল + ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়)।

পরহিণ—পরিহিত > পরহিন।

মৌলিল—মুকুলিত > মউলিঅ + ইল = মউলিল > মৌলিল।

শাব্দিক টীকা (৩৩ সংখ্যক) ঃ

বড্হিল—বর্ধিত > বড্হিল + ইল (অতীত বাচক) = বড্হিল।

বি আ এল—বিজাত > বি আ অ + (ই) ল (অতীত বাচক) বি আ অল, বি আ এল।

দুহিত্র—দুহ্যতে > দুহিঅই > দুহিত্র।

তিনা—ত্রীণি > তিণ্নি > তিনি, তিনা।

মৌ—সংঘলু > স + উ > মউ > মৌ।

নিবুধী— < নির্বুদ্ধি। পুঁথিতে আছে 'মৌ ধনি বুধী'।

ধনি < ধন্য। পুঁথির পাঠে 'সেই বুদ্ধির প্রশংসা রয়েছে। কিন্তু মুনী দত্তের টীকায় 'সেই বুদ্ধির' নিকৃষ্টতার কথা আছে।

ষিআলা < শৃগাল।

ষিহে—সিংহেন > সিহেঁ = ষিহে।

গুঝঅ < যুধ্যতে।

বিরলেঁ—কিন্তু পুঁথিতে আছে 'বিচিরলেঁ'। এটি লিপিভ্রম বলে অনেকের ধারণা।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (১ সংখ্যক) ঃ

সংপৃষ্ঠ > পচ্ছিত > পুছিঅ—জিজ্ঞাসা করিয়া।

চীএ—চিত্ত > চীঅ + এ (অধিকরণ বিভক্তি) = চীএ।

সুখে দুখেতেঁ—সুখে দুঃখে—অধিকরণ কারক এবং সুখ ও দুঃখের দ্বারা—করণকারক।

নিচিত—নিশ্চিত—অর্ধ তৎসম।

এড়ি এউ—ছাড়া হোক—অনুজ্ঞাকর্ম।

করণক—ইন্দ্রিয় সমূহের - ষষ্ঠী।

পাটের—পটুতার - সম্বন্ধপদ।

ভিড়ি—দৃঢ়ভাবে—অঙ্গে অঙ্গে চেপে—অসমাপিকা ক্রিয়া।

পইঠো—প্রবিষ্টঃ > পইট্ঠ (সমীভবন) > পইঠো।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (৫ সংখ্যক) ঃ

নিয়ড্ডী—নিয়ড্ডী / নিঅড়ি—য়-শ্রুতি।

দিঢ় - দৃঢ় / দিঢ় - তদ্ভব।

জোড়িঅ—অপভ্রংশ-অবহট্ঠের মতোই স্বরসংযোগ ঘটেছে—জোড়ি + অ।

ফাড়িঅ—ঐ-ফাড়ি + অ (কর্মবাচ্যে ও এইরূপ (ইঅ) প্রয়োগ দেখা যায়।

মাঝ—মধ্য > মজ্ঝ > মাঝ—সম-যুগ্ম ব্যঞ্জন বর্ণের একক ব্যঞ্জনে সরলীকরণ এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্তি হ্রস্বস্বরের পূরক দীর্ঘত্ব।

সাঙ্কমত = সংক্রম > সাঙ্কম + ত (< অন্তঃ), সাঁকোতে।

হোহী—ভব > হো + হি + (প্রাচীন অনুজ্ঞা ক্রিয়া বিভক্তি রক্ষিত) > হোহী।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (৬ সংখ্যক) ঃ

কাহেরে—কস্য > কাহ + এরে (কর্ম বিভক্তি)।

যিনি—অসমাপিকা ক্রিয়া।

মেলি—অর্থ (ত্যাগ করে) প্রাকৃত ও অপভ্রংশে 'ত্যাগ করা' অর্থে 'মেল্ল' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়।

পড়অ—পততি > পড়ই (মূর্ধণ্যীভবন ও ঘোষী ভবরণ)

তর মঁন্তে ✓ এস্ + শতৃ = এ্যসান্তে > তরসন্ত + এঁ = তরসন্তেঁ > তরসঁন্তো (নাসিক্য ধ্বনির পূর্ব সংক্রম।)

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (২৮ সংখ্যক) ঃ

উঁঞা—উচ্চ > উঞ্চ (বিষমীভবন) + আ (স্বার্থে) সংস্কৃত বসতি > বসই—তদ্ভব শব্দ।

গুঞ্জরী—গুঞ্জার (ফুলের) হার—ষষ্ঠী, স্ত্রীলিঙ্গ।

মা—নিষেধার্থে - অবহট্‌ঠ।

মহাসুখে—মহাসুখের দ্বারা—করণ, মহাসুখেতে অধিকরণ।

নির্বাণে > নিবাণে—অধিকরণ।

পাইসন্তে—প্রবেশ করতে—শতৃজাত অসমাপিকা ক্রিয়া।

কই সে—কি প্রকারে। করণকারক।

লোড়িব—খোঁজা হবে। কর্মবাচ্য।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (৩৩ সংখ্যক) ঃ

টালত—টাল + ত (অন্তঃজাত অধিকরণ বিভক্তি)।

বড়্হিল—বর্ধিত > বড়্হিঅ + ইল (অতীতবাচক) = বড়্হিল।

দুহিল—* দুহিত (= দুগ্ধঃ) > দুহিঅ + ইল (অতীত বাচক)।

দুহিল—বিশেষণ পদ।

দুধু—দুগ্ধ > দুদ্ধ > দুধ (= দুধ) > দুধু (স্বরসঙ্গতি)।

বি আ এল—বিজাত > বি আ অ > (ই) ল (অতীতবাচক)।

যামাঅ—সমায়তি > সমাআই > সমাই > সামাই (স্বরসঙ্গতি)।

যম = সম (অনুসর্গ)।

৪১.১০ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য—অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগোষ্ঠীর দাবি প্রসঙ্গ

প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া দুরূহ। এর ভাষারীতি রহস্যময়। ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', 'সরহের দোহা', 'কৃষ্ণাচার্যের দোহা' ও 'ডাকার্ণবে'র পুঁথি একসগে প্রকাশ করে তার মুখবন্ধে, (বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, পৃষ্ঠা ৬) লিখেছেন—

"যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই মতামত ভাষাতাত্ত্বিকগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মেনে নেননি। ভাষাতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার নানা পত্র-পত্রিকায় এবং ১৯২০ সালে 'The History of the Bengali Language' বক্তৃতামালায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চর্যা ও দোহাকোষগ্রন্থ দুখানিকে হিন্দি ভাষায় রচিত বলে মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯২৬ সালে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে ধ্বনি তত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও ছন্দের দিক দিয়ে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ডাকার্ণব ও দোহাগুলির ভাষা পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশ। কিন্তু চর্যার ভাষা বাংলা। তবে এই বাংলা ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব যে বেশি সেকথাও তিনি উল্লেখ করেন। তৎকালীন যুগে শৌরসেনী অপভ্রংশ ছিল সর্ব ভারতীয় গণ সাহিত্য রচনার সাধারণ মাধ্যমে। তার প্রতিফলন স্বাভাবিক ভাবেই চর্যাপদের ভাষাতে দেখা যায়। তবে চর্যাপদের বেশির ভাগ শব্দই যে মাগধী অপভ্রংশ জাত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান কালের ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে অসমিয়া ভাষা বৃহত্তর বঙ্গদেশের উপভাষারূপেই গণ্য হতো। তাই এই দুই ভাষার সঙ্গে চর্যার ভাষার ক্ষীণ যোগ থাকতেও পারে। মৈথিল ভাষার কয়েকটি ক্রিয়াপদ ও চর্যায় আছে। তবে এসব উপাদান আগন্তুক। সিদ্ধাচার্যগণ সমাজের গরিষ্ঠ অংশকে তাঁদের সহজিয়া সাধনতত্ত্বমুখী করতেই কথ্য ভাষা তথা উপভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন। চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে ড. নির্মল দাশের মন্তব্য—"এই ভাষা বহু উপভাষাবিশিষ্ট একটি মান্যেতর (Non-standard) কথ্য ভাষা।"

চর্যার রহস্যময় ভাষারীতি 'সন্ধ্যা' বা 'সান্ধ্য' ভাষারূপে পরিচিত। নানা গবেষণা ও আলোচনার সূত্র ধরে চর্যাগীতির ভাষাতে বাংলা এবং তা বাংলাদেশের বাঙ্গালীর রচনা এ বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। মৈথিল, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি পূর্ব ভারতের ভাষাগুলির অব্যবহিত জননীও এই মাগধী অপভ্রংশ। এদিক থেকে এরা বাংলার সমগোত্রীয়। এই জন্যই ভাষাগত বিচারে মৈথিল, ওড়িয়া, অসমিয়া ভাষা সম্প্রদায় চর্যার সাহিত্যিক উত্তরাধিকার দাবি করেন। অন্যদিকে দেখা যায়, চর্যাগীতির ভাষাগত মূল কাঠামোটি শৌরসেনী অপভ্রংশের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দি ভাষা এই অপভ্রংশ থেকেই সৃষ্ট। এই যুক্তি দিয়েই হিন্দি ভাষীর চর্যাপদ রচনার দাবি করে থাকেন। আঞ্চলিক এই দাবিদারদের দাবি কতদূর বিজ্ঞানসম্মত সেটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মৈথিলী ভাষা সম্প্রদায়ের যুক্তি হলো চর্যার অধিকাংশ কবি মৈথিলী ভাষী। চর্যার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বে মৈথিলী ভাষার প্রচুর মিল আছে। চর্যায় নাসিক্য ধ্বনির প্রাচুর্য ও দন্ত্য শিস্‌ধ্বনির প্রাচুর্যের সঙ্গে মৈথিলী সাদৃশ্য আছে। ব্যাকরণগত নানাদিক থেকেও উভয়ের মধ্যে মিল দেখা যায়। যেমন চর্যার 'আজি', 'সাঙ্গাম', 'তেন্তলী', 'টাঙ্গী' প্রভৃতি শব্দ মৈথিলীতে ব্যবহৃত। চর্যার অনেক ইডিয়ম ও প্রবাদ-প্রবচন মৈথিলী ভাষায় আছে।

কিন্তু এই যুক্তিগুলি ধোপে টেকে না। ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বাংলা ভাষারও প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। চর্যার যে শব্দগুলি মৈথিলী বলে দাবি করা হয় সেগুলি বাংলা শব্দভাণ্ডারেরও সম্পদ। চর্যার ইডিয়ম ও প্রবচনগুলি প্রাচীন বাংলার সম্পদ বলে গ্রহণ করতে ভাষাতাত্ত্বিক বাধা নেই। চর্যার যুগে চর্যাকারগণ ছিলেন 'বৃহৎ প্রত্ন-বঙ্গভাষী'। তখন বিহার এই ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ড. সুকুমার সেনের মতো ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও হিন্দিভাষীদের দাবি নস্যাৎ করেছেন। সুনীতিবাবুর মতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি যখন গড়ে উঠেছিল, তখন শৌরসেনী অপভ্রংশ পূর্ব ভারতের লোকজীবনে সাহিত্য সৃষ্টির সাধারণ বাহন হিসাবে বিবেচিত হতো। সুতরাং চর্যার ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের ব্যাপক প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রমুখ হিন্দিপ্রেমিক পণ্ডিতগণ চর্যার ভাষাকে প্রাচীন হিন্দি ভাষা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁদের এ সম্পর্কে যুক্তি হ'ল চর্যার শব্দরূপ হিন্দি শব্দরূপের খুব কাছাকাছি। চর্যা হিন্দির চিরাচরিত দোহা ছন্দে রচিত। কবিগণ বিহারের অধিবাসী ইত্যাদি। কিন্তু এই যুক্তিগুলি সহজেই খণ্ডন করা যায়।

চর্যায় পশ্চিমা অপভ্রংশ পদের প্রাচুর্য থাকলেও ভাষাগত মূল কাঠামোটির কোনো পরিবর্তন হয়নি। কাঠামোটি বাংলার কাছাকাছি। দোহা ছন্দ থাকলেও তা সীমাবদ্ধ। বিহারের নন, চর্যাকারগণ ছিলেন বৃহৎ প্রত্ন-বঙ্গবাসী।

বিজয় চন্দ্র মজুমদার হিন্দির পাশাপাশি চর্যাপদে ওড়িয়া লক্ষণ পেয়েছেন। তাঁর মতে, 'যামায়' নিঃসন্দেহে ওড়িয়া পদ। জঁহি, তঁহি, এঠু ইত্যাদি শব্দে এবং অধিকরণ পদ চান্দরে, বিষয়রে, ক্রিয়াপদ—অছ, ফিটিলি, অন্যান্য ওড়িয়া পদ যথা চিখিল, বেণি ইত্যাদির মধ্যেও সেই লক্ষণ আছে। ওড়িয়া শব্দের কিছু কিছু ব্যবহার দেখে চর্যাকারগণ ওড়িয়াবাসী এবং ওড়িয়া ভাষায় গীত রচনা করেছেন—এ দাবি কেউই মেনে নিতে পারেন নি। ঠিক একইভাবে অসমিয়ারাও দাবিদার হয়েছেন। তবে হিন্দি ও মৈথিলী ভাষার দাবিদারগণ সোচ্চার। কিন্তু খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেই সমস্যার সমাধান হবে না। চর্যাগানের ভাষা-পরিচয়গত সমস্যার মূলে রয়েছে ভাষাগত উত্তরাধিকারের বিষয়টি। নব্যভারতীয় আর্যভাষার দাবিদার হিন্দি, ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমিয়া এবং বাংলা। হিন্দির জন্ম শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে, অপর চারটি ভাষার উৎস মাগধী অপভ্রংশ। চর্যার ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের যে প্রাচুর্য দেখা যায় তা ঋণ গ্রহণ সূত্রে আহৃত। চর্যা ভাষার রূপতত্ত্বে হিন্দি ভাষার রূপ তত্ত্বর ধারাবাহিক কোনো যোগসূত্র নেই। চর্যাগীতির সঙ্গে হিন্দির ভাষাগত উত্তরাধিকত্বের যোগসূত্র ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়।

অপর চারটি ভাষার মধ্যে পারস্পরিক প্রত্ন ঔপভাষিক সম্পর্ক আছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ভাষা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু চর্যার যুগে স্বাধীন ভাষার স্তরে পৌঁছতে পারে নি। এর ভাষা বহু উপভাষা বিশিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য একটি কথ্য ভাষা। যাকে মগধীয় প্রত্নভাষা বলা যায়। এই ভাষার মধ্যেই সুপ্ত ছিল পরবর্তীকালের বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী ও অসমিয়া ভাষার বীজ। চর্যার প্রত্ন ভাষায় বঙ্গীয় প্রত্ন উপাদানের মাত্রা বেশি আছে। তাছাড়া অন্যান্য দিক থেকেও বলা যায়—চর্যাগীতির ভাষা বাংলা এবং এইসব গীত রচনা করেছেন অধিকাংশ বাঙালি। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষের যুক্তিগুলি নিম্নে বর্ণিত হলো।

চর্যার ভাষার নিজস্ব সম্পদ বাংলা পদ ও ইডিয়মগুলি। চর্যায় আমরা খাঁটি বাংলার শব্দরূপ দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ 'সুখে-দুখেতে', 'পাটের আস', 'হাঁড়ীত ভাত নাহি'—ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিশিষ্ট বাংলা অনুসর্গ ক্রিয়া বিভক্তিও চর্যাগীতিতে প্রচুর আছে। যথা—'গুণিআলেহুঁ', 'দুহিল দুধু', 'থির করি' ইত্যাদির প্রয়োগ বাংলা দেশের বাগ্‌ধারার একমাত্র সম্পদ।

শব্দরূপে তৃতীয়ায় তেঁ (৩) —'সুখদুখেতেঁ নিচিত মরি অই'। ৪র্থীতে—রেঁ (রে)—'সো কর উ রসরসানারে কংখা'। ৬ষ্ঠীতে—এর (র) 'হরিণা হরিণীর নিলঅন জানী'। সপ্তমীতে—তঁ, তে (তেঁ)-এ—'হাড়ীত ভাত নাই', 'বেন্টে যামাঅ' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত।

কতকগুলি বিশিষ্ট বাংলা অনুসর্গ চর্যাগীতিতে প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন, 'দি আঁ চঞ্চালী।' সঙ্গে, সাঙ্গে—'দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই। 'ডোম্বী এর সঙ্গে জো-জোই রত্তো' ইত্যাদি।

বিশিষ্ট ক্রিয়াবিভক্তি—'ইব' (ভবিষ্যতে)—'কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস।'

ইল, ইলা (অতীত)—'জে জে আইলা সে সে গেলা'। 'সসুরানিদ গেল'।

অস্ত্যর্থক ধাতুরূপে 'আছ' ও 'থাক' ধাতুর ব্যবহার—'জইতো মূঢ়া আচ্ছসি ভান্তী।'

চর্যায় ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচনের অধিকাংশই বাংলাদেশে প্রচলিত। শুধু তাই নয়, চর্যাপদের ধারাটি পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও ক্রমপ্রবহমান।

দৃষ্টান্ত ঃ 'আপনা মাংসে হরিণী বৈরী'—প্রবাদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বহুল ব্যবহৃত।

'জো সো চৌর সেই দুষাধী'—ভাষান্তরে রামেশ্বরের শিবায়ণে—'দিনে হও ব্রহ্মচারী রাত্যে গলাকাটা' হয়েছে।

'হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী'-র সঙ্গে শিবায়ন কাব্যের—'অষ্টাসিদ্ধি করে আছে ঘরে নাই ভাত' তুলনীয়।

চর্যাগীতির একাধিক গীতিতে 'বঙ্গাল', 'বাঙ্গালী'—জাতিবাচক শব্দ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি 'বঙ্গ' ছাড়া অন্য কোনো প্রদেশের নাম কোথাও নেই। পদশীর্ষে রাগ নির্দেশে 'গৌড়' নামটিও পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি নামও চর্যার গানে ছড়িয়ে আছে যেমন ডোম, চণ্ডাল, তাঁতি, তাম্বুলি, শুড়ি, গোয়ালা ইত্যাদি। কয়েকজন পদকর্তার নামেও এইরূপ জাতিবাচক ইঙ্গিত আছে।

জন্মগত দিক দিয়ে কিংবা কর্মযজ্ঞানুসারে চর্যার অনেক সাধক কবিই বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন তিব্বতী গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি সরহ, লুই, শান্তি রক্ষিত, কুক্কুরী পাদ, শবর পাদ প্রমুখ কবি বাংলাদেশেই থাকতেন। মণীন্দ্রমোহন বসু চর্যার ৪৯ সংখ্যক পদে 'বাজনার পাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ'-চরণের 'পঁউআ' খালকে বর্তমানের মহানদী বা পদ্মানদীর আদিরূপ বলে অনুমান করেছেন। ভুসুকুপাদকে তিনি অধুনা বাংলাদেশের বিক্রমপুরের লোক বলে চিহ্নিত করেছেন। ভুসুকুর একাধিক পদে 'বঙ্গালী' শব্দটিও আছে।

নদী, সাঁকো, নৌকা, নদী পার পারের দৃশ্য ইত্যাদির পাশাপাশি অন্ত্যজ শ্রেণির যে জীবনচিত্র চর্যাপদসমূহে আছে, তার মধ্য দিয়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবন ও প্রকৃতি চিত্রই প্রতিফলিত।

চর্যার গানগুলি যে সব অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, সেই অঞ্চলগুলি বাংলার শাসনকর্তাদেরই অধীন ছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে তালপাতার পুঁথিতে চর্যার পদ ও টীকাগুলি পেয়েছিলেন তা বাঙলা অক্ষরেই লেখা। এছাড়া চর্যার ভাষা ও সাহিত্য রীতির অনুবর্তন বাংলাসাহিত্যে যেমন হয়েছে, চর্যার দাবিদার অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে তেমন হয় নি।

চর্যার প্রবাদ প্রবচন, ব্যাকরণগত ভাষাগত নানাদিক ও প্রকৃতি জীবন চিত্র, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, সামাজিক তথ্যাদি থেকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, চর্যাপদ বাংলা ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালির নিজস্ব সম্পদ। চর্যাপদে বৃহত্তর বঙ্গের এমনকি বহির্বঙ্গের নানা প্রভাব থাকতেই পারে তবে সেসব উপাদান আগন্তুক।

৪১.১১ বিশিষ্টতা—উপসংহার

বিশিষ্টতা ঃ সাধনার ভিত্তিমূলে আছে গুরুবাদ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম সাধনাতেই গুরুবাদের প্রাধান্য দেখা যায়। চর্যাগীতিতেও এই গুরুবাদের বিশেষ গুরত্ব ও স্বীকৃতি আছে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্বের গূহ্য সাধনার বিষয় ও সাধন পদ্ধতি জানার জন্যই বৌদ্ধতন্ত্রের গ্রন্থাদিতে গুরুর গুরুত্ব অপরিসীম। চর্যাকারদের সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম ও নানাদিক থেকে তান্ত্রিক যোগাচারের প্রভাবে প্রভাবিত। পরমসত্য বা সহজানন্দ জপ-তপ আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় না। সহজস্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত শাস্ত্রপাঠেও জানা সম্ভব নয়, এর জন্যই সদ্‌গুরু বচনকে পাথেয় করে তাঁর নির্দেশিত পথেই চলার জন্য চর্যাকারগণ বলেছেন। লুইপাদের "লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅজাণ।।" এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তবে এই গুরুবাদে গুরুকে 'সহজ' লাভের উপায় হিসাবেই চর্যাকারগণ দেখিয়েছেন। গূহ্য সাধনতত্ত্বের ভাষাও প্রহেলিকাচ্ছন্ন। রূপকে সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে এই সাধনতত্ত্ব যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা অনন্য। কাব্যমূল্যের বিচারে, দেশ-কাল-সমাজ ভাবনার আলোকে ১০ম—১২শ শতাব্দীতে (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে) রচিত চর্যাগীতিগুলি বাংলা সাহিত্য ধারার উৎসরূপে চির-চিহ্নিত।

পাঁচজন চর্যাগীতিকারের ৫টি গীত আপনারা পড়ে পদকর্তা পরিচিত, প্রতিটি পদের বাচ্যার্থ, গূঢ়ার্থ জেনে প্রাচীন যুগের সমাজচিত্র সম্পর্কে আপনাদের মনে যে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক, তার উপাদান 'সমাজচিত্র' অংশে আপনারা পেয়েছেন। সেই সঙ্গে সহজিয়া সাধকদের অধ্যাত্ম ভাবনার স্বরূপটিও 'অধ্যাত্ম ভাবনা' অংশে আলোচিত হয়েছে। কাব্যমূল্য বিচার, শব্দার্থ, টীকা, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নানাদিক থেকে চর্যাপদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। গূঢ় সহজিয়া সাধনতত্ত্বমূলক পদগুলি যাতে সহজে অনুধাবন করতে পারেন, তার জন্য এই পর্যায়ের প্রতিটি অংশও সহজভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দেশ-কাল-সমাজের নানা অঙ্গ যথা—ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা, জীবন জীবিকা, দৈনন্দিন জীবনচিত্রের খুঁটিনাটি সম্পর্কেও মোটামুটি ধ্যান-ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। চর্যাগীতির ধারার অনুবর্তনেও দেখা যায় তুর্কী আক্রমণের পর বাংলদেশে সবদিক থেকে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল তা থেকে ধর্মচর্চা ও ধর্মসঙ্গীত রচনার ধারাও রেহাই পায়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাপদ আবিষ্কারের পর রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আর্নল্ড বাকে প্রমুখ গবেষকগণ নেপাল ও তিব্বত থেকে আরো কিছু চর্চাগীত আবিষ্কার করেন। তবে ভাষাগত বিচারে এই পদগুলি অর্বাচীন হলেও বিষয়বস্তু রচনারীতি ও রূপকের দিক থেকে এই সব গান প্রাচীন চর্যা গানেরই নিখুঁত অনুবর্তন। চর্যাগীতির ধারা বাংলাদেশ লুপ্ত হয়ে গেলেও চর্যা পদকর্তার সহজিয়া তান্ত্রিক-ধর্ম-সাধনার রূপরেখাটি পরবর্তীকালে নাথ সম্প্রদায়, বৈষ্ণবধর্মের সহজিয়া শাখা ও বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মভাবনার মধ্য দিয়ে অনেকটা প্রকাশ পেয়েছে। গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চর্যাগীতির ভাবগত ধারাটি বাউল গানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-ভাবনাতেও প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনা ও ব্যক্তি সচেতন আধুনিক সাহিত্যের যোগসূত্র রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে পাওয়া যায়। ঔপনিষদিক দীক্ষা ও বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কবির নিবিড় যোগের ফলেই ব্রহ্মচিন্তা ও মনের মানুষের অনুসন্ধানী দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চেতনায় একাত্ম হয়েছিল। হাজার বছরের চর্যাগীতের ঐতিহ্য নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগেও প্রবহমান।

৪১.১২ অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) 'পিবই' শব্দটির অর্থ হ'ল ———।

(খ) 'ধমন-চমন-বেণি-পাণ্ডি-বইঠার' মধ্য দিয়ে কবি ——— পদ্ধতির কথা বলেছেন।

(গ) 'লুই' শব্দটি ——— শব্দ থেকে উদ্ভূত।

(ঘ) লুইপাদ ও মীননাথ দুজন ——— ব্যক্তি।

(ঙ) বিষয় বাসনা চিত্ত ——— হয়।

(চ) ভুসুকুপাদ ——— কে চঞ্চল চিত্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

(ছ) শবরী হলেন ————।

(ছ) বাসনার নিবৃত্তিই ——— এর প্রকৃত উপায়।

২। নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিকচিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) ১নং পদটি ঢেণ্ঢন পাদের লেখা	☐	☐
(খ) নিবৃত্তির দ্বারা মহাসুখ লাভ হয়।	☐	☐
(গ) পরম নির্বাণ লাভের জন্য গুরুর নির্দেশের প্রয়োজন নেই।	☐	☐
(গ) চিত্ত হরিণ শান্ত-ধীর।	☐	☐
(ঙ) জরা-মৃত্যু ভীত জীবন 'শৃগাল' সম।	☐	☐
(চ) চর্যাপদে মহাযানী-তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।	☐	☐

৩। নিচের চরণগুলির সাধারণ ও তত্ত্বগত দিক ব্যাখ্যা করুন। (৪টি বাক্যের মধ্য দিয়ে)

(ক) 'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।'

.....

.....

.....

(খ) 'উঁচা-উঁচা পাবত তহি বসই শবরী বালী।'

.....

.....

.....

(গ) 'আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।'

.....

.....

.....

৪। নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন। (তিনটি বাক্যের সাহায্যে)

(ক) ঢেণ্ঢনপাদ তাঁর পদে কাকে চোর বলেছেন?

.....

.....

.....

(খ) ঢেণ্ঢন পাদ কাকে 'শৃগাল' এবং কাকে 'সিংহ' বলেছেন?

.....

.....

.....

(গ) পঞ্চভূত ও পঞ্চস্কন্ধ কি?

.....

.....

.....

(ঘ) চর্যাপদের আদি পদকর্তা কে? তাঁর সম্বন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

.....

.....

.....

(ঙ) শবরী কে? তার দেহশয্যার বর্ণনা দিন।

.....

.....

.....

(চ) সহজিয়া তত্ত্ব সাধনা বলতে কি বোঝেন?

.....

.....

.....

৫। নিচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

পুচ্ছিঅ, সুনুপাখ, ভণই, সেজি, বিন্ধহ, সামায়।

৬। ব্যাকরণগত টীকা লিখুন।

নিচিত, পাটের বসই, নিবানে।

৭। নিচের দেওয়া তথ্যাদির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) চর্যাপদ পাদাকুলক ছন্দে লেখা।	☐	☐
(খ) চর্যাপদের দাবিদার একমাত্র বাঙালি।	☐	☐
(গ) চর্যাপদের ভাষা সহজ-সরল।	☐	☐
(ঘ) চর্যাপদে নগরজীবন প্রাধান্য পেয়েছে।	☐	☐

৪১.১৩ উত্তরমালা

১। (ক) পান করা, (খ) প্রাণায়ম্, (গ) রোহিত, (ঘ) ভিন্ন, (ঙ) চঞ্চল, (চ) হরিণ, (ছ) নৈরাত্মা দেবী, (জ) মহাসুখলাভ।

২। (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল।

৩। (ক) দেহ যেন গাছের পাঁচটি ডাল।

পাঁচটি ডাল হলো পঞ্চ স্কন্ধ।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ।

এই পাঁচটি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে গাছের ডাল এবং দেহকে গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

(খ) উঁচু উঁচু পর্বত। সেখানে বাস করে শবরী বালিকা। মহাসুখচক্রে বজ্রধর শবরের সহজ গৃহিণী নৈরাত্মা দেবী বাস করেন। এই মহাসুখচক্র হ'ল—কায়া কঙ্কালরূপ সুমেরু শিখর।

(গ) হরিণের শত্রু তার নিজের মাংস। হরিণের মাংসের লোভেই শিকারীর দল তাকে ঘিরে ফেলে। অবিদ্যাবিমোহিত চিত্ত নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনে। তার চারদিকে জরা-মৃত্যু শিকারীর দল ধেয়ে আসে।

৪। (ক) সংসার জীবনে বিষয় সুখের প্রতি সকলের রয়েছে তীব্র আকর্ষণ। বিষয় সুখে মগ্ন চিত্তকেই ঢেণ্ঢন পাদ চোর বলে চিহ্নিত করেছেন। এই চিত্ত কখনই নির্বিকল্পরূপ লাভ করতে পারে না।

(খ) ঢেণ্ঢনপাদ বিষয় সুখে মগ্ন, জরা মৃত্যু ভয়ে ভীত চিত্তকে 'শৃগাল' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সর্ব ভীত চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখনই তা 'সিংহে' রূপান্তরিত হয়। এরপরই শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব।

(গ) পঞ্চভূত হ'ল—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। পঞ্চস্কন্ধ হ'ল—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ। প্রাণায়মের দ্বারা পঞ্চভূতের অশুদ্ধ দেহ শুদ্ধ হয়।

(ঘ) চর্যাপদের আদি কবি লইপাদ। লুইপাদ সিদ্ধাচার্যদের আদি গুরু। লুইপাদের দুটি চর্যাগীতি চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ে পাওয়া যায়।

(ঙ) বজ্রধর শবরের সহজ গৃহিণী নৈরাত্মা দেবী হলেন শবরী। শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করেছেন। গলায় গুহ্যমন্ত্ররূপ গুঞ্জা ফুলের মালা পড়েছেন।

(চ) গুরু নির্দেশিত গুহ্য পথ ধরে কায়া সাধনা করতে হবে। কায়া সাধনার মধ্য দিয়েই বিষচক্র পেরিয়ে নির্বাণ লাভ সম্ভব। এই নির্বাণ লাভের জন্য চাই গূঢ় তান্ত্রিক আচার-আচরণ।

৫। জিজ্ঞাসা করিও, শূন্যরূপ পাখা, বলে, শয্যা, বিদ্ধকর, ঢোকে।

৬। নিশ্চিত > নিচিত (অর্দ্ধতৎসম), পটুতার—সম্বন্ধ পদ, (সং) বসতি > বসই (তদ্ভব শব্দ) (সং) নির্বাণে > নিবাণে — অধিকরণ কারক।

৭। (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল।

৪১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি — ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

২। চর্যাপদ — মণীন্দ্রমোহন বসু।

৩। চর্যাগীতির ভূমিকা — জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — (প্রথম খণ্ড — পূর্বার্ধ) শ্রীসুকুমার সেন।

৫। চর্যাগীতি — তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

৬। চর্যাগীতি পরিক্রমা — ড. নির্মল দাশ।